দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

পাকিস্তানকে বিশ্বাস করে কূটনীতির ঐতিহাসিক ভুল আর নয়
— পৃঃ ২৫

গৌরবময় ভারত গড়ার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন একটি আদর্শ উদাহরণ : ভাগবত
— পৃঃ ২৯

৭৫ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা।। ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।। ২২ মাঘ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪ ।। website : www.eswastika.com

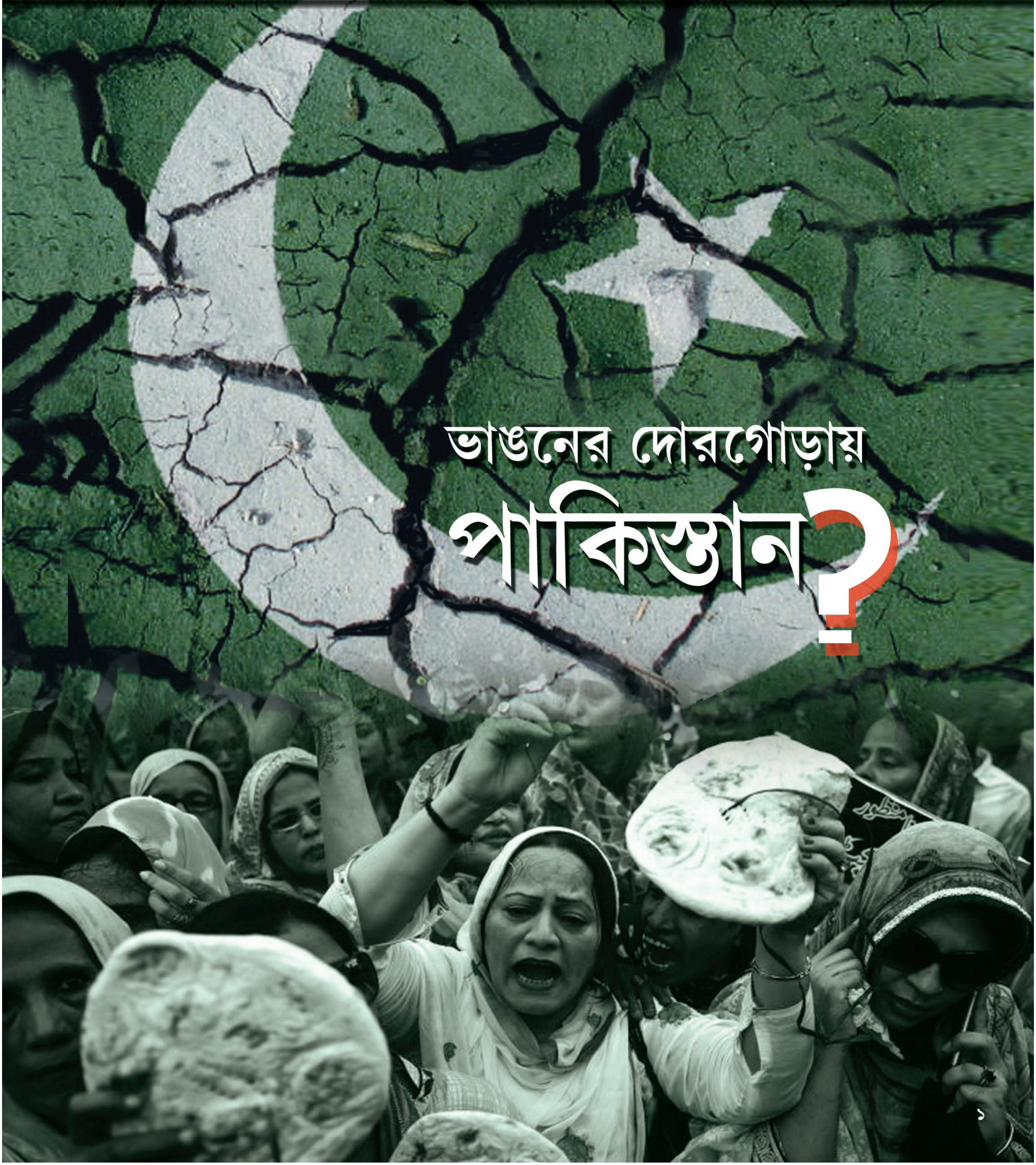

ভাঙনের দোরগোড়ায় পাকিস্তান?

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ২২ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

৬ ফেব্রুয়ারি - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

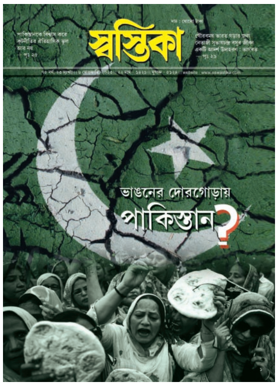

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

‘মমতা-মহামারীতে’ আক্রান্ত রাজ্যবাসীর রোগমুক্তি কি হবে? ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

রেডি আছে ভাইপো, নাহি ভয় ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

বিবিসি’র তথ্যচিত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা বকধার্মিকদের উপযুক্ত শিক্ষা ◻ স্বপন দাশগুপ্ত ◻ ৮

আর এক মহাকাণ্ড, কার্টুন কাণ্ড ◻ সঞ্জীব দে ◻ ১০

অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে ◻ দীপ্তাস্য যশ ◻ ১১

নেতাজীর জীবনাদর্শ ও ভারতবোধ ◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ১৩

ভারতের কাছে নতজানু পাকিস্তান ◻ দিগন্ত চক্রবর্তী ◻ ১৭

গণতন্ত্রের প্রধান প্রহরী দেশের মানুষ ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৮

ভারতকে ভাঙতে গিয়ে পাকিস্তান নিজেই ভাঙনের দোরগোড়ায় ◻ সুদীপ্ত গুহ ◻ ২৩

পাকিস্তানকে বিশ্বাস করে কূটনীতির ঐতিহাসিক ভুল আর নয় ◻ সুশান্ত মজুমদার ◻ ২৫

একটি ব্যর্থ দেশ ও তার স্তাবক অনুচরদের কিস্সা ◻ কৌশিক কর্মকার ◻ ২৭

গৌরবময় ভারত গড়ার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন একটি উদাহরণ : মোহনরাও ভাগবত ◻ ২৯

শ্রী, লক্ষ্মী, ধান্যলক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী এবং বাণিজ্য লক্ষ্মী ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এবং অরিত্র ঘোষ দস্তিদার ◻ ৩১

কাশীর চিরন্তন মহিমাদ্যুতি ◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ৩৩

মরিচঝাঁপির চুয়াল্লিশ বছর : কী ছিল গণহত্যার সম্ভাব্য কারণ? ◻ দেবযানী ভট্টাচার্য ◻ ৩৫

সাম্রাজ্যবাদ ব্যতিরেকে ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব ◻ সনাতন বিদ্যার্থী ◻ ৪৩

সংসদ বনাম বিচারব্যবস্থা সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যা মোটেই কাম্য নয় ◻ মন্দার গোস্বামী ◻ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮ ◻ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
১৩ ফেব্রুয়ারি
২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দিদির দূত

চারিদিকে দুর্নীতির পাহাড় এবং সরকারের প্রতি বাড়তে থাকা মানুষের অনাস্থার প্রতিকার করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন এলাকায় দলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্যোগের নাম দেওয়া হয় 'দিদির দূত'। মানুষ তাদের অভাব-অভিযোগের কথা সরাসরি দিদির দূতকে বলবেন এবং সরকার সেইমতো সমস্যার সমাধান করবে— এই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল মানুষের সমস্যার কথা শুনতে গিয়ে দিদির দূতরা প্রবল বিক্ষোভের সম্মুখীন হচ্ছেন। এই ঘটনা নিশ্চিতভাবে রাজ্যে তৃণমূল সরকার ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি বিশ্বাস ও জনপ্রিয়তার দিকেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এই দিদির দূত প্রকল্পের মুখ থুবড়ে পড়ার কারণগুলি বিশ্লেষণ করা হবে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায়। লিখবেন— ড. রাজলক্ষ্মী বসু, নিখিল চিত্রকর প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাসের সূতিকাগারে আগুন

বাংলাভাষায় বহুকাল ধরিয়া একটি প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, নিজের নাসিকা ছেদন করিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করা। প্রবাদবাক্যটি পাকিস্তানের আচরণ বর্ণনায় চমৎকার খাপ খাইয়া যায়। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাঙিয়া সৃষ্টি হইবার পর হইতে পাকিস্তানের শাসকবর্গ ভারতের ক্ষতির কথা চিন্তা করিয়া যত সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিয়াছেন তাহার সিকিভাগও নিজের দেশের উন্নতির জন্য করেন নাই। তাহারা ভারতের সহিত তিনবার যুদ্ধ করিয়াছেন এবং যেইক্ষণে বুঝিয়াছেন যে যুদ্ধ করিয়া ভারতের সহিত আঁটিয়া উঠা যাইবে না, যতবার যুদ্ধ হইবে প্রতিবার পাকিস্তানকে পর্যুদস্ত হইতে হইবে— সেইক্ষণে পাকিস্তানের মস্তিষ্কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে নূতন পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনা সন্ত্রাসবাদের। যুদ্ধে খরচ ও ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি। তুলনায় দরিদ্র পরিবারের যুবকদের কোরান হাদিসের উত্তেজক মাদক খাওয়াইয়া তাহাদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিলে তাহারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাণ্ডব করিবে, নিরীহ নর-নারীকে হত্যা করিবে, সরকারি সম্পত্তি বিনষ্ট করিবে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল, জিহাদের জিগির একবার উঠিলে তাহার ঢেউ মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশের মনে খুব সহজেই চিহ্ন রাখিয়া যায়। তাহারা ভাবিতে থাকেন জিহাদের অর্থ হইল স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ আর কাফেরের মৃত্যু হইল সেই যুদ্ধের বিজয়দুন্দুভি। পঁচাত্তর বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান এইভাবে ভারতকে ভাঙিবার প্রয়াস করিয়াছে এবং কার্যত পরিণত হইয়াছে সন্ত্রাসের সূতিকাগারে।

এক্ষণে সেই সূতিকাগারে আগুন লাগিয়াছে। হিন্দুহত্যার যত ভ্রূণ পাকিস্তান সেইখানে জমা করিয়াছে, ভারতের আত্মাকে অবমানিত করিবার যত স্বপ্নের বীজ বপন করিয়াছে সমস্ত কিছুই আজ লেলিহান শিখায় জ্বলিতেছে। পাকিস্তানের সন্ত্রাসের কারখানায় একদা আমেরিকা অর্থ দিয়া, অস্ত্র দিয়া, প্রযুক্তি দিয়া সহায়তা করিত। শীতল যুদ্ধের দিনগুলিতে সোভিয়েত রাশিয়াকে বশে রাখিবার জন্য পাকিস্তান ছিল আমেরিকার দাবার বোড়ে। টুইন টাওয়ার আক্রান্ত হইবার পর থেকেই দুই দেশের সখ্যে ভাটার টান। আফগানিস্তান হইতে আমেরিকার সৈন্য অপসারিত হইবার পর পাকিস্তানের জমি ব্যবহার করিবার বাধ্যবাধকতাও আমেরিকার আর নাই। তাই পাকিস্তানের এই ঘোর দুর্দিনে আমেরিকা নীরব দর্শক মাত্র। আইএমএফ-কে সামনে আগাইয়া দিয়া পাকিস্তানের স্কন্ধ হইতে হাত উঠাইয়া লইয়াছে আমেরিকা। ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভালো হইবার ফলে ইসলামিক দেশগুলিও অলিন্দ হইতে প্রতিবেশীর শবযাত্রা দেখিবার মতো করিয়া দেখিতেছে পাকিস্তানকে।

অগত্যা পকিস্তান শরণাপন্ন হইয়াছে তাহাদের 'চিরশত্রু' ভারতের। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ স্বীকার করিয়াছেন ভারতের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা উচিত কার্য করেন নাই। বারংবার যুদ্ধবিগ্রহে প্রভূত অর্থ খরচ করিবার ফলে পাকিস্তানের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। আজ পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিক সামান্য আটার জন্য লড়াই করিতেছে। তিন বৎসরের শিশুকন্যা ক্ষুধার নিকট অসহায় আত্মসমর্পণ করিয়া মায়ের কোলেই ঘুমাইয়া পড়িতেছে। বলাবাহুল্য, ভারতবর্ষ এই দৃশ্য দেখিতে অভ্যস্ত নহে। তাহার গোলায় ধান্য, গোয়ালে দুগ্ধ, পুষ্করিণীতে মৎস্য, উদ্যানে তরিতরকারি হইতে শুরু করিয়া ফলমূল কোনোকিছুরই অভাব নাই। খাইতে না পাইয়া কেহ মরিতে পারে আজিও ভারতবর্ষের মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দুঃসময়ে পাকিস্তানকে সহায়তা করিবার পূর্বে একবার নহে শতবার ভাবিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। বন্ধুর অনুগ্রহে প্রাণ ফিরিয়া পাইবার পর পাকিস্তান সেই বন্ধুর বক্ষেই ছুরি বসাইবে না, এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। বিশেষ করিয়া প্রতারণা যে দেশের অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান হাতিয়ার তাহাকে যাচাই না করিয়া বিশ্বাস করিবার ভুল করিলে তাহার মাশুল ভারতকেই গনিতে হইবে। যাহা কখনোই কাম্য নহে। সুতরাং প্রতিবেশীর দুঃসময়ে মানবিক হইতে হইবে কিন্তু অতিমানবিক হইবার প্রয়োজন নাই।

সুভাষিতম্

রোগ শোক পরিতাপ বন্ধন ব্যাসনানি চ।

আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্।।

রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন এবং নানাপ্রকার বিপত্তি যা মানুষ ভোগ করে, তা নিজের দ্বারা কৃত অপরাধবৃক্ষের ফল মাত্র।

‘মমতা-মহামারীতে’ আক্রান্ত রাজ্যবাসীর রোগমুক্তি কি হবে?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারী অনেকটাই দমে গিয়েছে। বিজ্ঞানকে ধন্যবাদ। তবে রাজনৈতিকভাবে সে মহামারীর ‘মমতাকরণ’ রাজ্যে মারাত্মক আকার নিয়েছে। প্রকোপের হাত থেকে রাজ্যবাসীর নিস্তার নিয়ে জল্পনা চলছে। পঞ্চায়েত আর লোকসভা ভোটের পর তার আন্দাজ মিলবে। এই মুহূর্তে রাজ্যের বিরোধী শিবির যে অবস্থানে রয়েছে তার থেকে ভালো অবস্থান বারো বছরে তারা পাননি। মমতা চতুর রাজনীতিক। তা নষ্ট করতে চান। মমতা যা বলেন তা করেন না। যা করবেন তা কাউকে জানতে দেন না। কংগ্রেসের আঁতুরঘর আর সিপিএমের শোধনাগারে তাঁর রাজনৈতিক জন্ম আর শিক্ষা। ভাগের খেলা তিনি খুব ভালো জানেন। তার তুলনায় রাজ্য বিজেপি সোজাসাপটা দল। নিজেরাই নিজেদের রাজনৈতিক তরজা সবার সামনে তুলে ধরেন। তবে আমার মনে হয় এই দুর্নীতির মধ্যে মমতার ছলাকলা কাজ করবে না যদি বিরোধীরা নিজেরা সব গুবলেট করে ফেলেন।

সারদা কেলেঙ্কারির মধ্যে দিয়ে মমতা-মহামারীর শুরু। তারপরেও তৃণমূল দুটি রাজ্য নির্বাচন জিতেছে। ফলে অনেকের ধারণা হয়েছে কেলেঙ্কারি আর দুর্নীতির ধোঁকা রাজ্যে মানুষ গিলে ফেলে ভুলে গিয়েছে। ‘লাল চুল কানে দুল’ এই হলো তৃণমূলের লুম্পেন সংস্কৃতি। এই ধারা এখন মশা-মাছি আর পিঁপড়ের মতো তৃণমূলকে ছেয়ে ফেলেছে। তাই ক্ষতি যে ঝট করে বন্ধ হবে কোনো সুস্থ মানুষ তা বিশ্বাস করেন না। তা আড়াল করতে আর নজর ঘোরাতে নতুন তৃণমূল বলে একটা ‘হাসজারু’ বাজারে ছাড়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যম-সহ অনেকেই তাতে সুর মিলিয়েছে। মমতার জয়ের পেছনে বিরোধীদের পারস্পরিক দলাদলি, আকচা-আকচি আর ভ্রান্তনীতি মমতাকে শক্তিশালী করেছে। আমিই আর আমার দল সবচেয়ে পবিত্র বা ‘হোলিয়ার দ্যান দাউ’ এই ভ্রান্ত ধারণায় বিরোধীরা এখন আবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। মমতা তার রাজনৈতিক ফয়দা সুদে-আসলে তুলে নিচ্ছেন।

১৯৯৬ সালে দলীয় সংবিধানের ১১২ নং ধারা দেখিয়ে সিপিএম কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিত্ব থেকে সরে এসেছিল। অথচ লজ্জার মাথা খেয়ে জনগণের কাছে ভোট চেয়েছিল। স্বাধীনতার পর থেকে ১৭টি লোকসভা ভোটে বেশিরভাগটাতেই বামেরা ১০ শতাংশের কম ভোট পায়। পরে ভুল বুঝতে পেরে সিপিএম তাদের সংবিধান পালটে ফেলে। তবে এখন আর কেউ সিপিএমকে দস্তুরি দিচ্ছে না। ইংরেজিতে ‘নো টেকার্স’। কোনো দল সিপিএমের বাতিল হয়ে যাওয়া ধারণার বোঝা বহন করতে রাজি নয়। বিজেপির গেরুয়া ঝড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগে বামেদের হয়তো তৃণমূলের লেজুড়বৃত্তি করেই কাটাতে হবে।

> “ভোট সংখ্যার হিসাবে মমতার সঙ্গে বিজেপির ফারাক অল্প। তাই মমতা হয়তো সিপিএমকে বিজেপির বিরুদ্ধে এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করছেন। তাকে বাড়তে দিচ্ছেন। নিজের দলের লোক ঢুকিয়ে সিপিএমের সভায় মেকি ভিড় বাড়াচ্ছেন।”

শোনা যাচ্ছে কমিউনিস্ট ফিনিক্সরা আবার ওড়ার চেষ্টা করছে। আর মমতা ইন্ধন জোগাচ্ছেন। যাতে বিজেপি বাড়তে না পারে। ভোট সংখ্যার হিসাবে মমতার সঙ্গে বিজেপির ফারাক অল্প। তাই মমতা হয়তো সিপিএমকে বিজেপির বিরুদ্ধে এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করছেন। তাকে বাড়তে দিচ্ছেন। নিজের দলের লোক ঢুকিয়ে সিপিএমের সভায় মেকি ভিড় বাড়াচ্ছেন। তবে শেষের মাথা এখনো দেখা যায়নি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবরক্ষক সিএজি আনুমানিক ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকার রাজ্য সরকারি কেলেঙ্কারি ধরে ফেলেছে। তারমধ্যে দুর্নীতিতে ডুবে থাকা রাজ্য শিক্ষাদপ্তর আর পঞ্চায়েত দপ্তর রয়েছে। আর রয়েছে মমতা-ঘনিষ্ঠ ফিরহাদ হাকিমের রাজ্য নগরোন্নয়ন বিভাগ। সব ফাঁস কাটলেও মমতা এই ফাঁস গলে খুব সহজে বোরোতে পারবেন বলে মনে হয় না। অবশ্য যদি বিরোধীরা নিজেরাই না ভুল করে আলগা করে দেয়। মমতা-মহামারীর শেষ দেখতে উদ্‌গ্রীব রাজ্যের মানুষ। বিরোধীদের সে কাজ করতে হবে। পারবে কিনা তা বলা মুশকিল।

রেডি আছে ভাইপো, নাহি ভয়

পিসিরূপেণ দিদি,

আপনি পিসি হিসেবে ইতিহাসে জায়গা পাবেন। কারও মা যেটা করে না, সেটাই আপনি পিসি হিসেবে করে দেখাচ্ছেন। দিদি জানেন, মাঝে মাঝে আমারও না, ভাই না হয়ে ভাইপো হতে ইচ্ছা করে।

কেন বলছি? আপনি কী করেছেন আপনি নিজেই জানেন না। আমিই বলে দিই বরং।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর ভাইপো সর্বভারতীয় দায়িত্ব পান। আর ২০২২ সালে সভা করেছেন সাকুল্যে পাঁচটি। সংখ্যায় মাত্র পাঁচ হলেও প্রতিটি জনসভাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে অভিষেকের ঘোষণায়। ২০২২ সালের প্রথম সভাটি ছিল হলদিয়ায়। ২৮ মে'র সভা থেকেই অভিষেক বন্দরশহরে শ্রমিকদের সমস্যা ও বেতন বৃদ্ধির দাবি নিয়ে একটি কমিটি গঠনের কথা বলেন। জেলাশাসক ও শ্রম দপ্তরকে নিয়ে সেই কমিটি হবে বলে জানান। এরপরে সে উদ্যোগও শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয় সভা ১২ জুলাই উত্তরবঙ্গের ধূপগুড়িতে। ওই সভা থেকেই তিনি সেচ ও বন দপ্তরের কাজ নিয়ে সরব হন। জানান, ১২-১৪টি নদ-নদী থাকা সত্ত্বেও বর্ষা ছাড়া ওই এলাকায় চাষের কাজ হয় না। কারণ, পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা না থাকা। অভিষেকের বক্তব্য যে আসলে নির্দেশ ছিল তার টের পাওয়া যায় ৭২ ঘণ্টার মধ্যে। ধূপগুড়ি চলে যান রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক।

উত্তরবঙ্গেই ছিল অভিষেকের তৃতীয় সমাবেশ। ১১ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ির মালবাজারে আইএনটিটিইউসি-র চা-শ্রমিকদের কর্মীসভায় যোগ দিয়ে দুটি ঘোষণা করেছিলেন। চা-বাগান সংলগ্ন এলাকাতেই হবে বাচ্চাদের ক্রেশ। সব চা-শ্রমিককে দেওয়া হবে পরিচয়পত্রও। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। তাঁর উদ্দেশে অভিষেক বলেন, ''আমি শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, প্রত্যেক চা-শ্রমিকের জন্য যাতে পরিচয়পত্র তৈরি করা হয়।'' শুধু অনুরোধ জানানোই নয়, ওই কাজের জন্য শ্রমদপ্তরকে তিনমাস সময়ও বেঁধে দেন অভিষেক। সেই কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে পরে নিজেই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। ওই সভা থেকেই চা-শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল তৈরির কথা বলেছিলেন তিনি। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে গিয়ে দিদি আপনি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে সে ঘোষণাও করে দিয়েছেন। মানে সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছে ভাইপো। পরে তাতে সিলমোহর সরকারের।

এ তো দেখছি দিদি আপনি ইন্দিরা গান্ধী হয়ে উঠছেন। আর আপনার লালন পালনে সরকারের বাইরে থেকেও সরকার চালাচ্ছেন এ কালের সঞ্জয় গান্ধী। এটাকেই তো বলে, এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল অথরিটি। সবাই বলছে, তৃণমূল চালাচ্ছে পুলিশ আর সরকার চালাচ্ছেন অভিষেক।

চতুর্থ সভা গত ডিসেম্বরের তিন তারিখে কাঁথিতে। সেই সভার রাজনৈতিক গুরুত্ব আলাদাই ছিল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর শহরে গিয়ে অন্য কথার সঙ্গে মৎস্যদপ্তর ও বিদ্যুৎদপ্তরের কাজকর্ম নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। কী কী করতে হবে তাও বলেন। দেখা যায়, এর পরেই বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে তৎপর হন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এখন পর্যন্ত শেষ তথা পঞ্চম সভাটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে অভিষেকের বক্তব্যের কারণে। ১৭ ডিসেম্বর রাণাঘাটের মঞ্চ থেকে তাঁতশ্রমিকদের সমবায়কে বাড়তি উদ্যোগ নিতে হবে বলে জানান অভিষেক। এর পরে তারও প্রশাসনিক প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। দিনকুড়ির মধ্যে সমবায় দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বদলে দেয় নবান্ন। গত ১৬ জানুয়ারি ওই পদে এসেছেন পিবি সেলিম। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাক্তন জেলাশাসক সেলিম তো অভিষেকের পছন্দের লোক।

আরও অনেক নজির রয়েছে। বিক্ষুব্ধ চাকরিপ্রার্থীদের নিয়ে তাঁর ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে অভিষেকের বৈঠক। জুলাই মাসের সেই বৈঠকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে সকলের চাকরি হবে।

ভাবা যায়! এ তো দেখছি আপনি ইন্দিরা গান্ধী হয়ে উঠছেন। আর আপনার লালন পালনে সরকারের বাইরে থেকেও সরকার চালাচ্ছেন এ কালের সঞ্জয় গান্ধী। এটাকেই তো বলে, এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল অথরিটি। সবাই বলছে, তৃণমূল চালাচ্ছে পুলিশ আর সরকার চালাচ্ছেন অভিষেক।

সমালোচনা তো হবেই। আমি বরং দেখছি আপনি কীভাবে দ্বিতীয় প্রজন্ম তৈরি করছেন। দেখছি, একজন মায়ের মতো পিসিকে।

পরিবারতন্ত্র টিকিয়ে রাখার এই লড়াইকে আমার সেলাম। চালিয়ে যান পিসি। ভাইপো আপনার পাশে আছে। □

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

বিবিসি-র তথ্যচিত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা বকধার্মিকদের উপযুক্ত শিক্ষা

অতি প্রাচীন বেতার সম্প্রচার সংস্থা ইংল্যান্ডের বিবিসি সম্প্রতি 'India the Modi Question' নামের ২০ বছর আগে ঘটে যাওয়া গুজরাটের হানাহানির ওপর আপন খেয়ালে কী এক তথ্যচিত্রের প্রথমাংশ বাজারে এনেছে। ২০০২-এর পর আদালত নিযুক্ত তদন্ত কমিটি ও সুপ্রিমকোর্টের রায়ে নিষ্কলঙ্ক ঘোষিত হওয়ার পরও তাদের মোদী-আক্রমণে যে ভাটা পড়েনি এটি তার প্রমাণ। স্বাভাবিক ভাবে দেশ জুড়ে নানা প্রতিক্রিয়া, অস্থিরতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্যের ওপর চাপ পড়ছে। অতীতের কংগ্রেস শাসনকালে নিষেধাজ্ঞা খুব হালকা চালে বলবৎ করা হতো। উদাহরণ খুঁজলে দেখা যাবে একবারে প্রথমদিকে ফরাসি চলচ্চিত্রকার লুই ম্যালের 'phantom India' বা তুলনায় বেশি প্রসিদ্ধ সলমন রুশদির 'Satanic verses' বই দুটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। প্রথমটি নিয়ে বিশেষ টানাপোড়েন শোনাই যায়নি আর দ্বিতীয় গ্রন্থটি নিয়ে মুসলমান সমাজের মধ্যে একটা চাপা প্রতিবাদ অঞ্চলভিত্তিক হয়েছিল। একই সঙ্গে বিপরীত সম্প্রদায় থেকে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়েই এই ধরনের কাজ শুরু করেছে, এমন প্রতিবাদও উঠেছিল। কিন্তু এর পর অন্য অনেক চলচ্চিত্র, বই, বিকৃত ইতিহাস লিখন ও সাহিত্যে প্রচারধর্মিতা নিয়ে প্রবল বিতর্ক সংগঠিত হয়েছে। একেবারে হাতের কাছেই উদাহরণ রয়েছে।

কাশ্মীরের '৯০ সালের মর্মস্পর্শী হিন্দু নিধন ও বিতাড়ন যজ্ঞের ওপর 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' নামে প্রায় তথ্যচিত্রের আকারের বিবেক অগ্নিহোত্রীর ছবিটি নিয়ে তুলকালাম হয়ে গেল। কিন্তু একটা নতুন উপলব্ধি মানুষের মধ্যে দেখা গেল যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশলের যুগ, পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা করার সুবিধের যুগে কোনো নিষেধাজ্ঞাকে আক্ষরিকভাবে প্রয়োগ করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কাজ। বামপন্থী মানসিকতার ছাত্রদের ছাত্রাবাসগুলিতে জবরদস্তি ওই ইংরেজ নির্মিত তথ্যচিত্রটির ওপর এত মমত্ববোধ জাগালো যে তারা বীরত্ব প্রদর্শন করে সেখানে যে কোনো মূল্যে সেটি প্রদর্শন করার জন্য লড়াই করে হিরো হতে চাইছে। এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায় যদি কিছু কিছু রাজ্য সরকার এই ধরনের তথ্যচিত্রে স্বয়ং পুলকিত বোধ করে বা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করেন তাহলে কত সহজে এই নিষেধাজ্ঞাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়।

এই বক্তব্যের মধ্যে এটা বোঝার কোনো কারণ নেই যে নরেন্দ্র মোদী সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে একটু বেশি মাত্রায় প্রতিক্রিয়া দিয়ে ফেলেছে। উলটে 'the modi question' তথ্যচিত্র অনেকটা অযাচিত প্রচারই পেয়ে গেল। বিরোধী দলগুলি তড়িৎগতিতে বিষয়টিকে গলাধঃকরণ করে নিয়ে পুরনো intolerence-এর হুজুগ নিয়ে কাদা মাখাতে শুরু করল।

গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে ছবিটিতে নতুন কোনো তথ্য নেই, দীর্ঘ অতীত ধরে গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে যা জনসমক্ষে উঠে এসেছে। তাছাড়া অনুসন্ধানের মাধ্যমে যা জানা গেছে তার সারমর্ম হলো এই যে, ব্রিটিশ হাই কমিশনের অভ্যন্তরীণ তদন্তে জানা গেছে গুজরাট হানাহানির ক্ষেত্রে মোদীর নাকি সদর্থক ভূমিকা ছিল না। তিনি দাঙ্গাবাজদের ওপর কড়া অ্যাকশন নেননি। এই বিষয়টি নিছকই 'কাট অ্যান্ড পেস্ট' করেছেন অত্যন্ত নীচুতলার ইংরেজ আমলাতন্ত্রের এক থার্ড সেক্রেটারি। যার উৎস ও তথ্য হিসেবে ব্যবহার হয়েছে— একেবারে হাতের কাছে পাওয়া ভারতের ইংরেজি ভাষার মিডিয়া হাউসগুলির। বয়ান তাদের উপসংহারই এখানে ধ্রুবসত্য হিসেবে পুনঃপ্রচারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, দাঙ্গা সংক্রান্ত এই একপেশে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সিদ্ধান্তগুলিকে পরবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট কিছু এনজিও এবং মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন গ্রুপ খুব বাহবা দেয়। তারা ঘোষণাই করে দেয় গুজরাট হানাহানি বাস্তবে রাজ্য পরিচালিত বড়ো ধরনের মুসলমান সংহারের পরিকল্পনা। প্রথমদিকে দেশের আদালতগুলি এই ধরনের কুপ্রচারে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে রিপোর্টগুলির ওপর আস্থা আরোপ করা শুরু করেছিল। কিন্তু হায়! ২০০২ সালের গুজরাট নির্বাচনে মোদীর বিপুল জয় হলো। একই সঙ্গে আদালতের তত্ত্বাবধানে চলা দীর্ঘ তদন্ত নিঃসঙ্কোচে জানাল, যে সমস্ত বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটেছে এবং যে ধরনের হিংসা হয়েছে তার কারণ অত্যন্ত জটিল।

এখন এই বিবিসি তথ্যচিত্রের মূল সমস্যা, যাবতীয় অসমর্থিত খবরগুলিকে জড়ো করে পরিবেশন করা শুধু নয়, একই সঙ্গে আদালত নিযুক্ত স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন দলের সমীক্ষা এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সরকারকে সমস্ত রকম অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের দায় থেকে বেকসুর মুক্তি ও নির্দোষ ঘোষণা করার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা। এর উদ্দেশ্য একটিই ছিল, যারা তথ্যচিত্রটি দেখবেন তারা বুঝতে

পারবেন যে ভারতে মুসলমানরা প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য স্বীকার করে কোনো রকমে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বেঁচে আছে।

ছবির উপজীব্য বহু অভিযোগ পূর্বেই দেশে বিদেশে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্যও গোপন নয়, মোদী সরকারকে আধিপত্যবাদী প্রমাণ করা। বিরুদ্ধবাদীরা এমন অস্থির। ২০১৪'র পর ২০১৯-এ মোদী আরও বেশি গরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে এসেছেন। এর ওপর সাম্প্রতিক জুন ২০২২-এর সর্বোচ্চ আদালতের রায় যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও হিংসা পরিচালনার দায় থেকে মোদী ও তাঁর তৎকালীন সরকারকে মুক্তি দেওয়ায় প্রায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। স্বাধীন ভারতে একটি দীর্ঘতম বেদনাদায়ক অধ্যায় শেষ হয়েছে। কিন্তু গেড়ে বসা ইকোসিস্টেম এটি হজম করতে পারেনি। তারা মোদীকে দুষ্ট শক্তির ফলিত রূপ বলতে ভালোবাসে। এই ইংরেজ তথ্যচিত্র সেই প্রমাণহীন, বিশ্বাসযোগ্যতাহীন, আক্রোশপ্রসূত মিথ্যা আক্রমণের সর্বশেষ প্রমাণ।

হ্যাঁ, অনেকে এটা বলছেন যে এই তথ্যচিত্রকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা উচিত ছিল। আস্তে আস্তে মানুষ ভুলে যেত। খুব বেশি হলে লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউস ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর এমন অযাচিত ও কুৎসিত আক্রমণের বিষয়টি বিবিসি কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথভাবে নথিবদ্ধ করালেই হতো। না, এখানে কোনো ধরনের দুর্বল প্রতিক্রিয়া পেলেই সেটিকে দেশের সামগ্রিক পরাজিত মানসিকতা বা বিষয়টিকে ঢোক গিলে মেনে নেওয়ার ব্যাখ্যা দেওয়া হতো। ভবিষ্যত খুলে যেত আরও কট্টরবাদী তথ্যচিত্র নির্মাতাদের। যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সারা বিশ্বের কাছে ভারতের ছবি আরও মলিন করে প্রদর্শন করার তাগিদ পেত।

পাশ্চাত্যের তথাকথিত মানবতাবাদী বা সমাজকর্মীদের একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষিত আছে। সেটি সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রমরমার সময়ের। উপনিবেশবাদের দৌরাত্ম্য যদিও আজ অস্তমিত কিন্তু একটা কাল্পনিক অছি পরিষদের সদস্য থাকার অনুভূতি সাম্রাজ্যবাদীরা সদা বয়ে বেড়াতে ভালোবাসেন। এই অছি অনুভবকে সহজ করে বোঝাতে গেলে বলতে হয় এটা সেই বড়োদের মধ্যে ছোটোদের জন্য যেমন একটা সবজান্তা ভাব থাকে যে আমি জানি তোর কীসে ভালো হবে। তুই মুখ্যু, তুই কিছু বুঝিস না। আমাদের কথা শোন, সব ঠিক করে দোব। ব্যাপারটা এই রকম। তোমার জন্য আমি সদা দয়াবান (ছদ্ম) ও তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী— এই যে ছদ্মবেশ একে কিন্তু বিশ্লেষণ করলে উঠে আসবে বর্ণবৈষম্যবাদ। আরে! তুমি আদতে কালো তো, আমি অনেক বেশি বুদ্ধিমান। আমায় মেনে চল।

আমার মনে হয়, আমাদের বিদেশ দপ্তরের যে মুখপাত্র এই অসত্য তথ্যচিত্রের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক মহলকে প্রেস কনফারেন্সে জানচ্ছিলেন তাঁর মনে এই ভাবনায়ই উঠে আসছিল। তিনি পাশ্চাত্য উপনিবেশিক মানসিকতাটিকে নিখুঁত ধরেছিলেন। বিবিসি ভারতের মতো দেশ ও গণতন্ত্রের অধিকর্তা হওয়ার যোগ্যতা নিয়েই প্রচ্ছন্নভাবে প্রশ্ন তুলেছেন। এর মানে এই নয় যে ভারতের যাবতীয় গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি সবই ত্রুটিহীন এবং তাদের কোনো সংস্কার হতে পারে না। কিন্তু আলোচ্য তথ্যচিত্রটির মধ্যে সেই ধরনের কোনো একটি বিচ্যুতির নির্দিষ্টকরণ নেই। এর কেন্দ্র ও মূল ফোকাস ছিল এমন বক্তব্য প্রচার করায় যে ভারতের ভোটার ও শাসকরা নির্বোধ ও সংকীর্ণমনা। তারা সদা হিংসায় ও শয়তানের পূজা করতে আনন্দ পায়। বিদেশি প্রচার এটাই বোঝাতে চায়, ভারতের যতই অগ্রগতি হোক না কেন এর অভ্যন্তরে একটা পচা আঁস্তাকুড় আছে।

এই জন্যই প্রতিবাদ করা ও জোর গলায় ঘোষণা করা দরকার যে ভারতকে অনে সমীহ ও আতঙ্কের চোখে দেখুন বিশেষ করে সর্বোচ্চ পদে যখন আসীন আছেন মোদী। সেই জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা চোখে আঙুল দিয়ে দেখান সেই সমস্ত লোককে যে কোথায় থামতে হবে। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোকসংবাদ

উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রথম সেবিকা শ্রীমতী অনিতা চক্রবর্তী গত ১২ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। সঙ্ঘ, সমিতি ও স্বস্তিকা অন্তঃপ্রাণ ছিলেন তিনি। প্রতিটি স্বস্তিকা পাঠ করার পর রেখে দিতেন এবং পরে সবাইকে পড়াতেন। ১৯৮০ সাল থেকে সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর একটা নিবিড় সম্পর্ক। সবাইকে ছেলের মতো যত্ন করতেন। স্বয়ংসেবক ও প্রচারকদের সঙ্গে মাতৃসুলভ ব্যবহার তাঁকে সঙ্ঘের 'মা' করে তুলেছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি এক ছেলে, দুই মেয়ে, পুত্রবধূ ও এক নাতিকে রেখে গেলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার কলিগ্রাম শাখার স্বয়ংসেবক তপন দাস ও স্বপন দাসের পিতৃদেব গোপালচন্দ্র দাস গত ২৫ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

ঝাড়গ্রাম জেলার মানিকপাড়া খণ্ডের ঝাটিবাঁধ শাখার স্বয়ংসেবক তথা জেলা কার্যকারিণীর সদস্য বুবুল মাহাতর বাবা কিশোর মাহাত গত ২৩ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

আর এক মহাকাণ্ড, কার্টুন কাণ্ড

সঞ্জীব দে

অবশেষে কার্টুন কাণ্ডের সমস্ত মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র। ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল নেতা মুকুল রায়কে নিয়ে একটি ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশের কারণে পূর্ব যাদবপুর থানায় অম্বিকেশ মহাপাত্রের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো ব্যঙ্গচিত্র বা মিম সর্বজনীন করার অপরাধে দীর্ঘ ১১ বছরের আইনি লড়াই লড়তে হলো কোনও ভারতীয় নাগরিককে।

গত লোকসভা ভোটের মুখে বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমার এক অরাজনৈতিক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রশ্ন করেন, "এই যে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনাকে নিয়ে নানা মিম ছড়িয়ে পড়ছে, এই বিষয়টাকে আপনি কীভাবে দেখেন?" উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অবশ্যই সৃজনশীল, খানিকটা হলেও তার নিজের সৃষ্টি তো বটেই।"

এই মিম কথাটির অর্থ হলো, 'যা গ্রহণযোগ্য নয়, অথচ সমাজ গ্রহণ করছে।' এই মিম অনেকটা আমাদের সময়ের খবরের কাগজের কার্টুনের মতো। মনে পড়ে কিশোর বয়সে খবরের কাগজ পড়ার লোভে পাড়ার চা দোকানে বড়োদের ভিড়ে ঢুকে পড়তাম। কাগজটা হাতে পেয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়তাম। সব খবরের মাঝে খুঁজে নিতাম সেই রোজের দেখা পরিচিত নামগুলো—সুফি, কুট্টি, তির্যক প্রমুখ। সেই সব মহান কার্টুনিস্ট কলমে আঁকিবুকিই ছিল তাদের শৈল্পিক ভাবনা এবং তাঁদের বাস্তবিক উপলব্ধি। যা রূপ নিত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাময়িক ছবির।

শাসক হোক বা বিরোধী, কেউ বাদ যেত না। তিনি জ্যোতি বসুই হোন না বা সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। বিখ্যাত কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী একবার বাম জমানার বাংলা বন্‌ধকে ব্যঙ্গ করে কার্টুন এঁকেছিলেন— সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো কলকাতার ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, লরি, ঠেলাগাড়ি, রিকসা। পাশে লেখা সোমবার বাস ধর্মঘট, মঙ্গলবার ট্রাম ধর্মঘট, বুধবার ট্যাক্সি ধর্মঘট, বৃহস্পতিবার লরি ধর্মঘট, শুক্রবার রিকশা ধর্মঘট, শনিবার ঠেলাগাড়ি ধর্মঘট। বাম আমলে কোনো রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর ওপর কার্টুন আঁকার অপরাধে মামলা মোকদ্দমা হয়েছে বলে শোনা যায়নি কখনো।

বছর দুয়েক আগে লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেওয়া হয়েছিল হাওড়ার দাশনগরের বিজেপি যুব মোর্চার মহিলা নেত্রী প্রিয়াঙ্কা শর্মাকে। তাঁর একটি মিম ঘিরে থানা-পুলিশ, আইন-আদালত পর্যন্ত হয়েছিল। প্রিয়াঙ্কা শর্মা তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার 'মেট গালা' পোশাকে দেখিয়েছিলেন। হাওড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের জনৈক নেতার অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে প্রিয়াঙ্কাকে। হাওড়ার জেলা আদালতের বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিলেও প্রিয়াঙ্কার পরিবার এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। শীর্ষ আদালত প্রিয়াঙ্কার জামিন মঞ্জুর করে।

পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত কার্টুনিস্ট আর কে লক্ষ্মণের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে নিয়ে বিভিন্ন কার্টুনের মধ্যে অন্যতম কার্টুন ছিল, চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারত পরাজিত। নেহরু একটি পাথর খণ্ডের উপর বসে উদাস নয়নে একটা অর্ধ ফোটা গোলাপের দিকে তাকিয়ে আছেন, পাশে রাখা ওনারই লেখা বই 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া'। এই কার্টুনের প্রতিবাদে কোনোরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি নেহরু। আর কে লক্ষ্মণ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নাকটা বিশেষভাবে আঁকতেন। তাতে ইন্দিরা মনঃক্ষুণ্ণ হলেও তা কখনোই আদালত পর্যন্ত গড়ায়নি। ১৯৯০ সালে আর কে লক্ষ্মণের শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরের ওপর আঁকা কার্টুনটি নিয়ে চর্চা হয়েছিল যথেষ্ট। বালাসাহেব ঠাকরে নিজেও একজন কার্টুনিস্ট ছিলেন। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল গভীর। তাঁর একটি কার্টুন ছিল এরূপ ঃ ঠাকরে সাহেব একটি চেয়ারে বসা। সামনে দাঁড়ানো জোটসঙ্গী বিজেপির প্রতিনিধির বসবার একটি চেয়ার, যার উপর ঠাকরে সাহেব পা তুলে দিয়েছেন। আর পাশেই রাখা একটি জলচৌকির দিকে ইশারা করে অতিথিকে বসতে বলছেন। এই কার্টুনে আর কে লক্ষ্মণ বোঝাতে চেয়েছেন, বাল ঠাকরের অহংকার আর জোটসঙ্গীর প্রতি উদ্ধত মনোভাব।

একটা সময় খবরের কাগজে নিয়মিত ছাপা হতো কার্টুন। শিল্পীর রসবোধ থেকে জন্ম নেয় কার্টুন। আর বাঙ্গালির রসবোধের অভাব পড়েছে এমনটাও নয়। তবু আজ কাগজের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে কার্টুন।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, 'বর্তমান সময়ে খবরের কাগজের কার্টুনিস্টরা হলেন ক্রিকেট টিমের দ্বাদশ ব্যক্তিটির মতো।' একটা সময় খবরের কাগজে নিয়মিত ছাপা হতো কার্টুন। শিল্পীর রসবোধ থেকে জন্ম নেয় কার্টুন। আর বাঙ্গালির রসবোধের অভাব পড়েছে এমনটাও নয়। তবু আজ কাগজের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে কার্টুন। বর্তমান পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত বলেছিলেন, 'খবরের কাগজে কার্টুন হলো সুন্দরীদের বিউটিস্পটের মতো। থাকলেও চলে, না থাকলেও চলে।' প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ভ্রমণ বিলাসিতার ওপর আর কে লক্ষ্মণের কার্টুনটি ছিল গান্ধীপরিবারের দেশের প্রতি উদাসীনতার এক জীবন্ত ছবি— 'রাজীব গান্ধী সমুদ্রসৈকতে খোলা আকাশের নিচে বসা, পাশে স্ত্রী সোনিয়া। সোনিয়া তাঁর স্বামীকে বলছেন, তুমি এখন পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, গরিবি, দাঙ্গা, বেকারত্ব থেকে অনেক দূরে। ওসব ভাবনা ছেড়ে বরং ভাবো পরবর্তী ছুটি আমরা কোথায় কাটাবো।'

না, এই কার্টুন ঘিরে হয়নি কোথাও মামলা মোকদ্দমা। দীর্ঘ এগারোটি বছর শারীরিক ও মানসিক হেনস্থার পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র। অবশেষে আইনের কাছে হার মেনেছে স্বৈরাচারী শাসক। প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ করা যাবে না। মুক্তির খুশিতে অম্বিকেশবাবু বলেছেন, 'কার্টুন আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোনো স্বৈরাচারী শাসক কার্টুন বন্ধ করতে পারবে না। আমি আবারও কার্টুন শেয়ার করবো।' আর রসিক বাঙ্গালি বলবে, কার্টুন থাক সুন্দরীদের বিউটিস্পটের মতোই। ◘

অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে

দীপ্তাস্য যশ

বর্তমানের পাকিস্তান এবং ইংল্যান্ডকে দেখলে এই প্রবাদটির কথাই মাথায় আসে। যদিও প্রবাদটি একেবারে যথোপযুক্ত নয়, তাও এদের বর্তমান অবস্থা বোঝানোর জন্য এর থেকে ভালো প্রবাদ আমার অন্তত মাথায় আসছে না।

এদের নিজেদের দেশের অর্থনীতির ভাঁড়ে মা ভবানী। একজন প্রধানমন্ত্রী ছ'মাসও নিজ পদে থাকেন না। আর একটি দেশ পাকিস্তান, সেখানে যে কে সরকার, আর্মি নাকি আইএসআই, তারা নিজেরাই ঠিক করে জানেন না। গোটা দেশ দৌড়াচ্ছে আটার লাইনে দাঁড়ানোর জন্য। কাশ্মীর ভুলে এখন আটার বস্তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে ব্যস্ত, তারাই আবার আমাদের জ্ঞান দিত।

বিবিসি একটি ডকুমেন্টারি বানিয়েছে, বিষয় গুজরাট দাঙ্গায় নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকা। অর্থাৎ, আমাদের সুপ্রিম কোর্টে সব অভিযোগ খারিজ হয়ে গেলেও এমনকী অভিযোগকারিণী নিজে মিথ্যে অভিযোগের দায়ে সুপ্রিম কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেলে চলে গেলেও বিবিসি এখনও মানতে রাজি নয় যে, নরেন্দ্র মোদী নির্দোষ। ভাবখানা এমন যে তারা আমাদের প্রভু এবং তারাই আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা। তারা যা বলবে তাই সত্য। তার বাইরে অন্য কিছু আর সত্য হতেই পারে না।

আসলে এতদিন পাকিস্তান নামক ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে ব্রিটেন এবং আমেরিকা যে কাজটা করাতো, এখন সর্বস্বান্ত ভিখিরি দেশ পাকিস্তানকে দিয়ে আর সে কাজটি হচ্ছে না। ফলে এখন তাদের নিজেদেরই আসরে নামতে হয়েছে। কিন্তু আজকের শক্তিশালী ভারতের সঙ্গে সরাসরি শত্রুতা করার সাহস নেই তাদের। কারণ, তার মূল্য চোকাতে হবে অনেক। তাই কখনো বিবিসি, কখনো নিউইয়র্ক টাইমসকে হাতিয়ার করছে। আচ্ছা, এইসব সংবাদ মাধ্যমগুলিতে কখনো দেখেছেন পাকিস্তান, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের দুর্দশা নিয়ে কোনো বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে? এদের যত চিন্তা ভারতের সংখ্যালঘুদের নিয়েই।

বর্তমান ভারত বামপন্থী কলোনিয়াল হ্যাংওভারকে বহু আগেই পিছনে ফেলেছে। তাই পশ্চিমী প্রচারযন্ত্রের উদ্দেশ্য কখনোই সফল হবে না। ২০২৪ সালে আরও একবার শক্তিশালী সরকার গঠনের মাধ্যমে ভারত আরও এক কদম এগিয়ে যাবে বিশ্বগুরুর স্থান অধিকারে।

এর কারণ একটাই, ভারতের ক্রমশ অর্থনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে ওঠা। এর অর্থ এশিয়া এবং আফ্রিকার এক বিশাল অংশে ব্যবসার নামে আজও যে সাম্রাজ্যবাদ পশ্চিমি দেশগুলি এবং চীন চালায়, তা প্রবল ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এর ফলে তৃতীয় বিশ্বের এই দেশগুলিকে শোষণের মাধ্যমে এরা নিজেদের দেশে যে অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রেখেছে তা ভেঙে পড়বে। সেই কারণেই এরা মরিয়া ভারতের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে একটি পুতুল সরকার বসাতে। সেই সূত্রেই আরব বসন্তের ঢলে এদেশেও মাঝেমাঝেই আওয়াজ তোলা হয়, 'আজাদির'। কখনো অধিক উৎকণ্ঠায় সরাসরি ভারতকে টুকরো করার আহ্বানও জানানো হয়। আগে এই কাজটাই পাকিস্তানকে সামনে রেখে করনো হতো। এখন দেউলিয়া পাকিস্তানের দ্বারা আর সে কাজ সম্ভব হচ্ছে না বলে ব্রিটেন, আমেরিকা সরাসরি নিজেরাই ময়দানে নেমেছে।

স্বাধীনতার পরে দীর্ঘ সময় পাকিস্তানকে পশ্চিমি দুনিয়ে মদত দিয়ে গেল শুধুমাত্র ভারতে অশান্তি জিইয়ে রাখার জন্য। পাকিস্তানকে বিপুল অর্থ সাহায্য দেওয়া হলো যাতে তারা একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে পারে। তারপরেও যখন ১৯৪৮, ১৯৬৮ ও ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনা ভারতের সামনে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল (এর মধ্যে '৭২ সালে রীতিমতো সরকারি স্তরে আত্মসমর্পণ করে) তখন শুরু হলো

ফঃ ২

কাশ্মীরের আজাদির নামে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া। পাকিস্তানকে মাধ্যম করে পশ্চিমি দুনিয়া কাশ্মীরে জেহাদের নামে ভারতের অখণ্ডতাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করে। সেই সময় কিন্তু কোনো পশ্চিমি সংবাদমাধ্যম কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপরে হওয়া নির্মম অত্যাচার নিয়ে কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। বরং পরবর্তীতে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট এই জেহাদিদের ওপর ভারত রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী কী নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে, কীভাবে প্রতিদিন সেখানে জেহাদিদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে সেই সংক্রান্ত গল্প বানিয়ে পেশ করেছিল। এর থেকেই বোঝা যায় ভারতকে নিয়ে এদের মাথাব্যাথাটা ঠিক কোন জায়গায়।

সেই সময় যখনই ভারত এই প্রসঙ্গ আন্তর্জাতিক নানা মঞ্চে উত্থাপন করার চেষ্টা করেছে, প্রতিবারই পশ্চিমি দেশগুলি বলেছে, 'এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা'। সবসময়ে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ধর্মীয় জেহাদ এবং সন্ত্রাসকে মদত যুগিয়েছে এভাবেই। এমনকি পাকিস্তানকে যখন আমেরিকা এফ-১৬ যুদ্ধবিমান দেয় সেই সময় ভারত এই যুদ্ধবিমানগুলি কিনতে চাইলেও তারা বেচতে অস্বীকার করে। ভারতকে সবসময় সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ব্যতিব্যস্ত রাখাই ছিল এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর সেই কাজে পাকিস্তান ছিল ভাড়াটে গুন্ডা।

তৎকালীন ভারতীয় নেতৃত্বের দুর্বলতাও একটি কারণ ছিল পশ্চিমি দেশগুলির এই বাড়বাড়ন্তের পিছনে। যেমন ১৯৭১ সালে সুযোগ থাকলেও আমরা পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিইনি। তা যদি নেওয়া হতো তাহলে আজ আফগানিস্তান এবং সেন্ট্রাল এশিয়ার উপরে ভারতের নিয়ন্ত্রণ অনেক জোরালো হতো। কিন্তু তৎকালীন নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে আমরা তা করতে পারিনি। ঠিক যেমন লাদাখ এবং কাশ্মীরে আমাদের দেশের এক বিশাল অংশ চীনকে ছেড়ে রেখে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। বিনিময়ে আমরা পেয়েছি চিরকালীন সীমান্ত শত্রুতা।

এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে ২০০০ সাল নাগাদ। একদিকে ভারতে একটি জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যদিকে ভারতবাসী গ্লোবালাইজেশনের যুগে নিজেদের ব্যক্তিগত দক্ষতার ভিত্তিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। আজকের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের বিপুল প্রভাবের সূত্রপাত সেই সময় থেকেই। একসময় বামপন্থী এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন যে ভারত পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণেই অধিক অভ্যস্ত ছিল, আজ শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে আমরা নিজস্ব প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছি।

অর্থনীতিতে আমরা আজ ব্রিটেনেরও আগে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থার রিপোর্ট বলছে, আগামী পাঁচ থেকে ছয় বছরে আমরা বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনীতি পরিণত হবো। শক্তি, প্রযুক্তি, ফার্মাসি, কারিগরি শিল্প-সহ আরও নানা ক্ষেত্রে আমরাই বিশ্বে প্রথম সারিতে যাবো। বিশ্বের একস বিশাল অংশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হবে ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে। অপরদিকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে ইউরোপের অর্থনীতির বেহাল দশা। আমেরিকার অর্থনীতি প্রায় চিরস্থায়ী মন্দার কবলে চলে গেছে। ব্রিটেনের তো এমন অবস্থা যে সে দেশে কেউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বই নিতে রাজি হচ্ছিলেন না। চীনের অবস্থা দেখুন, বায়োলজিক্যাল অস্ত্র তৈরি করতে গিয়ে তার জেলের তারা নিজেরাই আজ জেরবার।

পশ্চিমি দুনিয়া যখন ব্যস্ত ছিল পাকিস্তানের মদতে ভারতে সন্ত্রাসবাদের প্রসার এবং প্রভাব বাড়াতে, তখন ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিজেদের আত্মনির্ভর করে তোলায় মন দিয়েছেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভুল শুধরে নিয়ে ভারতবাসীকে দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকে মুক্তি দেওয়া সদিচ্ছা। সেই ক্ষেত্রে অন্যতম পদক্ষেপ জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে বিশেষ এক শ্রেণীর মৌরসিপাট্টার অবসান ঘটানো। পশ্চিমি দুনিয়া পাকিস্তানকে ব্যবহার করে আবারও ভারতকে সন্ত্রাসের জালে জড়ানো। কিন্তু যারা আটার বস্তা নিয়ে কাড়াকাড়ি ব্যস্ত তারা আর কাশ্মীর নিয়ে কী ভাবনাচিন্তা করবে? সেই সঙ্গে দুটি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পরে পাকিস্তান এও বুঝেছে যে, দিন পাল্টেছে। এখন ভারতে সন্ত্রাস চালানোর চেষ্টা করলে পাল্টা আঘাত আসতে পারে। সেই সঙ্গে আছে বালুচ বিদ্রোহ। বাংলাদেশের স্মৃতি এখনও প্রতিদিন পাকিস্তানিদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। অতএব ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে কাজ হচ্ছে না বলে পশ্চিমি দুনিয়া এবার ময়দানে নেমে পড়েছে।

বিবিসি একা নয়, নিউইয়র্ক টাইমস-সহ অনেকেই নানা বিষয়বস্তু নিয়ে নানা মিথ্যে প্ররোচনা দিচ্ছে। আদতে এগুলি হলো ২০২৪ সালের আগে ভারতে একটি দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি করা। যেখানে সংখ্যালঘু জনগণ দাঙ্গা করবে ঠিক যেমন মাঝে মাঝেই দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় সরকারি মদতে। তেমনই আরও নানা দাঙ্গা লাগানো হতে পারে এবং পশ্চিমি দুনিয়া তাকে 'আজাদির যুদ্ধ' বলে বর্ণনা করবে। সব মিলিয়ে চেষ্টা হবে ভারতের পরিবেশকে অশান্ত করে তোলার। সামাজিক পরিস্থিতিকে বিষময় করে তুলে ভারতের অর্থনৈতিক গতিকে রুদ্ধ করার চেষ্টাও করা হবে।

আশার কথা, বর্তমান ভারত বামপন্থী কলোনিয়াল হ্যাংওভারকে বহু আগেই পিছনে ফেলেছে। তাই পশ্চিমি প্রচারযন্ত্রের এই উদ্দেশ্য কখনোই সফল হবে না। ২০২৪ সালে আরও একবার শক্তিশালী সরকার গঠনের মাধ্যমে ভারত আরও এক কম এগিয়ে যাবে বিশ্বগুরুর স্থান অধিকারে। ◻

নেতাজীর জীবনাদর্শ ও ভারতবোধ

পিন্টু সান্যাল

শ্রী অরবিন্দ যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে অবসর নিয়ে যোগসাধনার জন্য পণ্ডিচেরীতে গেলেন সেই সময় ১৩ বছরের সুভাষ কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। ১৯১২ সালে কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে শুনলেন অরবিন্দের কথা।

১৯২১ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে কৃতকার্য হয়েও ইংরেজের চাকরি ছেড়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে সুভাষচন্দ্রের তখনও নয় বছর বাকি। এই নয় বছরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রী অরবিন্দের শূন্যতা পূরণ হয়নি। ছোটোবেলা থেকেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে বিশ্বাসী কিশোর সুভাষ স্বাভাবিকভাবেই যুবক বয়সে স্বাধীনতা লাভের পন্থা হিসেবে অরবিন্দের আদর্শেই বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। অরবিন্দ ভারত রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবোধের যে যোগসূত্রকে উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতবর্ষের সংস্কৃতির যে প্রাণকেন্দ্রকে চিহ্নিত করে দেশবাসীকে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপণ লড়াইয়ের আহ্বান করেছিলেন তার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা অভিন্ন ছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা শুধু ভারতীয়দের মানবাধিকার নয়, তার এক বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। ভারতবর্ষের একটা 'লক্ষ্য' আছে যার জন্য ভারতীয় সভ্যতা এতবার বৈদেশিক আক্রমণ সত্ত্বেও বেঁচে আছে। ১৯২৭ সালে লেখা এক চিঠিতে সুভাষচন্দ্র বলছেন—''ভারতীয় জাতি একাধিকবার মরেছে—কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতের অস্তিত্বের সার্থকতা ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎসভায় শুনাতে হবে; ভারতের শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্বমানবের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না।''

বিশ্বসভ্যতার উন্মেষের জন্য যে ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে আপোশহীন সংগ্রামে নেমেছিলেন 'দেশনায়ক', সেই দেশ, দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে কী ছিল সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি? এর উত্তর আমরা পাই, সুভাষচন্দ্রের নিজের কথায় 'In order to understand India, however, it is essential to bear in mind at the outset two important facts. Firstly, the history of India has to be reckoned not in decades or in centuries, but in thousands of years.' অর্থাৎ ভারতবর্ষকে বুঝতে তিনি ভারতের কয়েক হাজার বছরের সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতিই দৃষ্টি দিতে বলেছেন। ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষের অসীম বিভিন্নতা সহজে চোখে পড়লেও ভারতের বিভিন্ন বর্ণ, ভাষা, পরিধান ও অভ্যাসকে অতিক্রম করে যে ঐক্যসূত্র ভারতবর্ষকে এক অখন্ড সত্ত্বা হিসেবে বেঁধে রেখেছে তা হচ্ছে সনাতন ধর্ম। সুভাষচন্দ্রের কথায় ''সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যসূত্র হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। উত্তর বা দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিম, যেখানেই আপনি ভ্রমণ করুন না কেন, আপনি একই ধর্মীয় ধারণা, একই সংস্কৃতি এবং একই ঐতিহ্য পাবেন। সমস্ত হিন্দু ভারতকে পবিত্র ভূমি হিসেবে দেখে। পবিত্র নগরীর মতো পবিত্র নদীগুলো সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। যদি একজন ধার্মিক হিন্দু হিসেবে আপনাকে আপনার তীর্থযাত্রা শেষ করতে হয়, আপনাকে দক্ষিণতম প্রান্তে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর এবং উত্তরে তুষারাবৃত হিমালয়ের বক্ষে বদ্রীনাথে যেতে হবে।

যে মহান গুরুরা দেশকে তাদের বিশ্বাসে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন তাদের সর্বদা সমগ্র ভারত ভ্রমণ করতে হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য, যিনি খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, চারটি 'আশ্রম' (মঠ) তৈরি করেছিলেন যা আজও সমৃদ্ধ। সর্বত্র একই ধর্মগ্রন্থ পড়া এবং অনুসরণ করা হয় এবং আপনি যেখানেই ভ্রমণ করুন না কেন মহাকাব্য; মহাভারত ও রামায়ণ সমানভাবে জনপ্রিয়।" [The most important cementing factor has been the Hindu religion. North or South, East or West, wherever you may travel, you will find the same religious ideas, the same culture and the same tradition. All Hindus look upon India as the Holy Land. The sacred rivers like the sacred cities are distributed all over the country. If as a pious Hindu you have to complete your round of pilgrimage, you will have to travel to Setubandha-Rameswara in the extreme south and to Badrinath in the bosom of the snow-capped Himalayas in the north.

The great teachers who wanted to convert the country to their faith had always to tour the whole of India and one of the greatest of them, Shankaracharya, who flourished in the eighth century A.D., built for 'Ashramas' (monasteries) in four corners of India, which flourish to the day. Everywhere the same scriptures are read and followed and the epics, the Mahabharata and the Ramayana, are equally popular wherever you may travel.]

ঋষি অরবিন্দ কারামুক্তির পর বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণে সনাতন ধর্ম ও জাতীয়তাকে সমার্থক বলেছিলেন। অসুস্থ সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক নির্বাসন নিয়ে ১৯৩৩ সালের মার্চে ইউরোপে যান এবং সেইসময় তাঁর লেখা 'The Indian Struggle'এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপ বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন। ভারতবর্ষের অখণ্ডতা নিয়ে সন্দিহান সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে নেতাজীর স্পষ্ট জবাব 'Only through ignorance or through prejudice could one assert that under British rule India began to experience for the first time what political unity was.' রোমাঁ রোলাঁ তাঁর অভিনন্দন বার্তায় জানিয়েছিলেন 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জানতে হলে এই বই অপরিহার্য। ঐতিহাসিকের মহত্তম গুণ আপনার লেখায় ফুটে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণ রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে ধর্মপথে এগিয়ে যেতে শুনিয়েছিলেন উপনিষদের সার 'গীতা'র বাণী আর সুভাষচন্দ্র ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বকে শোনালেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। ইংরেজদের পরাধীনতা ভারতবর্ষের মানুষ কখন অনুভব করেছিল? কী কারণে ভারতীয়রা প্রথম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করে? সুভাষচন্দ্রের উত্তর 'In the meantime British missionaries had been active in trying to impart their culture and their religion to the Indian people. Out of these different sources there arose a consciousness on the part of the Britishers of a cultural or civilising mission in India. It was this which produced the first revolt among the Indians.' [The Indian Struggle]। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ভূমি নিজের সংস্কৃতির, জীবনপদ্ধতির উপর আঘাতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রথম স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল।

শুধু চিন্তাধারাই নয়, অরবিন্দের কর্মপন্থার সঙ্গেও সুভাষচন্দ্র বসুর মিল লক্ষণীয়। একদিকে কংগ্রেসের ভেতরে প্রয়োজনীয় সংস্কারের চেষ্টা করে 'নরম' কংগ্রেসকে 'গরম' করা আর অন্যদিকে কংগ্রেসকে স্বাধীনতার মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে উৎসাহ দান। ১৯৩৪ সালে ইউরোপে নির্বাসিত সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বের স্বাধীনতা আন্দোলন, তৎকালীন ইউরোপের ইতিহাস ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের তুলনা করে উপলব্ধি করেছেন, অহিংসবাদের প্রতি অযৌক্তিকভাবে ঝুঁকে থাকার কারণেই ভারতবর্ষ দুর্বল হয়ে পড়েছে আর অহিংসবাদের সীমাহীন প্রয়োগের ফলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ১৯২১ সালে দেশবন্ধুর ডাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিজেকে সঁপে দিতে দেশে ফিরে গান্ধীজির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই নেতাজী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিকল্পনা নিয়ে গান্ধীজিকে প্রশ্ন করেন। কিন্তু সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর বাস্তববাদী নেতাজীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দের আদর্শে বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্র জানতেন ক্ষাত্রতেজের বিকাশের মাধ্যমেই ঘোর তামসিকতায় নিমগ্ন জাতির পুনর্জাগরণ সম্ভব। দুর্বলের অহিংসার মূল্য কেউ দেয় না। তাইতো মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নির্দেশনায় একের পর এক আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে আর তার সঙ্গে বেড়েছে রাজনৈতিক বন্দি ও আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের অত্যাচার। কংগ্রেসে নিজের শুরুর দিনে যুব কংগ্রেসের দায়িত্ব পেয়েছিলেন সুভাষ। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে সেনাবাহিনীর পোশাকে সুসজ্জিত প্রায় ২০০০ জন তরুণ ও ৫০০ জন তরুণীর সম্মিলিত কুচকাওয়াজে সামরিক কায়দায় সভাপতিকে অভিবাদন জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলমুক্ত করার পন্থা গঠন করেছিলেন বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স যার G.O.C তিনি নিজে। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সহায়তায়, সুভাষচন্দ্রের তৈরি করা বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স পরবর্তীকালে দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একদিকে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন আর অন্যদিকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলন—এই দুইয়ের মিলনবিন্দু

সুভাষচন্দ্র বসু। বিপ্লবীদের উপর পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে ছুটে গিয়েছেন মেদিনীপুর, চট্টগ্রামে। তরুণদের ডাক দিয়েছেন ভারতমাতার সেবায় এগিয়ে আসতে।

নিজের রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের দেখানো পথেই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব পরিবর্তন করতে উদ্যোগী ছিলেন নেতাজী। কিন্তু অনশনে যতীন দাশের মৃত্যু বরণকে কংগ্রেসের প্রস্তাবে মর্যদা দান হোক বা ভগৎ সিংহের ফাঁসি রদ করতে গান্ধীজির ভূমিকা—সবেতেই নিরাশ হতে হয় 'দেশনায়ক'কে। তবুও আশা ছাড়েননি। গান্ধীজীর সঙ্গে প্রবল মতপার্থক্য হলেও নিজের জনপ্রিয়তাকে আশ্রয় করে পরপর দুবার নির্বাচিত হন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে কিন্তু সভাপতি যেই হোক না কেন কংগ্রেস চলবে গান্ধীজীর কথায়। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে চেয়েছিলেন ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাইরের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজকে চরম আঘাত দিতে। কিন্তু পরাধীন ভারতবাসী ইংরেজদের হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অস্ত্র ধরবে কিন্তু দেশ স্বাধীন করতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়—এই ছিল গান্ধীজির অহিংসা তত্ত্ব। বিশ্বকবির একের পর এক চিঠিও মহাত্মার মনে সুভাষের জন্য জায়গা তৈরি করতে পারেনি, সুভাষ তখন তার কাছে 'Spoilt Child'। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গঠন করেছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক। কংগ্রেসের ভেতরে থাকা সুভাষকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও একা সুভাষ আরো ভয়ঙ্কর। তাই ইংরেজ যে সময় মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে সুভাষচন্দ্র বসুকে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই সময় নেতাজী ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে পেশোয়ার, কাবুল, মস্কো হয়ে বার্লিনে। জার্মানি তখন ইংরেজের চরম শত্রু। শত্রুর শত্রু বন্ধু।

তাই জাপান, জার্মানি, ইতালির সঙ্গে নেতাজীর বন্ধুত্ব। কিন্তু বন্ধুত্ব নিজের মতাদর্শকে, আত্মসম্মানকে বিসর্জন দিয়ে নয়। তাই হিটলার, মুসোলিনিকে স্পষ্টভাষায় জানাতে পেরেছিলেন যে ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের শুধু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যই ব্যবহার করা যাবে অর্থাৎ শুধু ইংরেজদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ভারতবর্ষে ততদিনে এমন মতাদর্শের প্রবেশ ঘটেছে যার সমর্থকদের আনুগত্য এমন একটি মতের প্রতি যার ফলে তারা নিজের দেশের হিতের বিরোধী হতেও দ্বিধা করে না। যতদিন ইংলান্ডের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার কোনো কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না আর জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়া পরস্পরের বন্ধু ছিল, ততদিন ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে ইংরেজ শত্রু ছিল। জার্মানি, সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার পর ইংল্যান্ড ও সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্ক তৈরি হয় আর ইংরেজ হয়ে যায় কমিউনিস্টদের বন্ধু। বর্তমানেও চীনের প্রতি কমিউনিস্টদের মনোভাব আমাদের অজানা নয়। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'Peoples War' ম্যাগাজিন নেতাজীকে 'তোজোর কুকুর' বলতেও দ্বিধা করেনি।

রাসবিহারী গুরুদ্বারে নেতাজী।

নেতাজী দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদেশের সাহায্য চেয়েছিলেন কিন্তু ফ্যাসিজম বা কমিউনিজমকে কখনো সমর্থন করেন নি। কমিউনিজম আর ফ্যাসিজম এর মিলগুলো তিনি তুলে ধরেছেন 'The Indian Struggle' বইতে। তাঁর মতে কমিউনিজম আর ফ্যাসিজম উভয়েই ব্যক্তির অধিকারকে খর্ব করে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে নিন্দা করে, উভয়েই দলীয় একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং মতের বিরোধীদের দমন করে। ভারতবর্ষে কমিউনিজম যে মানুষের দ্বারা একদিন প্রত্যাখ্যাত হবে তার ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন নেতাজী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। রাষ্ট্রবাদের বিপক্ষে অবস্থানকে কমিউনিজম এর বিফলতার প্রধান কারণ হিসেবে বলেছিলেন নেতাজী। সোভিয়েত রাশিয়াতে চার্চের বিরোধী হিসেবে কমিউনিজম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও ভারতের ক্ষেত্রে ধর্মবিরোধী মনোভাব সেইভাবে নেই। আর কমিউনিজমের অর্থনৈতিক তত্ত্বের কিছুটা ভারতবর্ষে গৃহীত হলেও, ভারতে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের বিশ্লেষণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মনে করতেন নেতাজী। তাই সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের প্রায় অর্ধশতাব্দী আগেই নেতাজী বলেছিলেন, ভারতবর্ষ কোনোভাবেই সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন সংস্করণ হবে না।

নেতাজীর পরিকল্পনা ছিল শুধু স্বদেশকে নিয়ে। ১৯২৭ সালে দাদা শরৎচন্দ্র বসুকে এক চিঠিতে লিখেছেন, 'যদি আমার বলশেভিক এজেন্ট হইবার ইচ্ছা থাকিত, তবে আমি সরকার বলিবামাত্র প্রথম জাহাজেই ইউরোপ যাত্রা করিতাম। তথায় স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর বলশেভিক দলে মিশিয়া সমগ্র জগতে এক বিরাট বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে প্যারিস হইতে লেলিনগ্রাড পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতাম; কিন্তু আমার সেরূপ কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নাই। স্বদেশমুক্তিকে পেছনে রেখে কোনো আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না সুভাষচন্দ্র বসু। কমিউনিজম সংস্কৃতিকে অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি কৃত্রিম কাঠামো মনে করে। কিন্তু ভারতবর্ষের সভ্যতার ঐক্যসূত্র হলো সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ।

নেতাজী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন কিন্তু সেই সমাজতন্ত্র ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব তা বিবেকানন্দের দেখানো পথেই পুষ্টিলাভ করবে। স্বামীজীর বাণী উদ্ধৃত করে ১৯২৯ সালের মার্চে এক বক্তৃতায় বলেন 'এই তো বাংলার Socialism। এই Socialism এর জন্ম কার্ল মার্কসের পুঁথিতে নয়। এই Socialism এর জন্ম ভারতের শিক্ষাদীক্ষা ও অনুভূতি হইতে। ঐ একই বক্তৃতায় নেতাজীর সাবধান বাণী 'বলশেভিক রুশজাতির চিন্তাধারা যেরূপ দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হইতেছে তাহাতে আমার মনে হয় যে জ্ঞানালোকের জন্য রাশিয়ার উপর অতিনির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে'।

কখনো দুরারোগ্য রোগের আক্রমণ, কখনো নির্বাসন, কখনো পিতৃবিয়োগ, কখনো স্বাধীনতা আন্দোলনে সহকর্মীদের ঈর্ষা কোনো কিছুই টলাতে পারেনি সুভাষচন্দ্রকে। প্রয়োজন সুভাষের ভেতরের সেই মানসিক শক্তির উৎসকে চেনা, সেই শক্তি সঞ্চয়ের অনুশীলনকে বোঝা। মান্দালয় জেলে কারারুদ্ধ অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের উপলব্ধি ''ভয় জয় করার উপায় শক্তিসাধনা। দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্তি শক্তির রূপবিশেষ। শক্তির যে কোনো রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের দুর্বলতা ও মলিনতা বলিস্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করতে পারে। আমাদের মধ্যে অনন্তশক্তি নিহিত হইয়াছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে। পূজার উদ্দেশ্য—মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা। এই শক্তিসাধনার কথাই তো বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-এ আর অরবিন্দ 'ভবানী মন্দির'-এ। মান্দালয় জেলে দুর্গা পূজার জন্য অনশন আর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সরস্বতী পূজার অধিকার আদায় করে নেতাজী দেশবাসীকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শক্তির আরাধনায় অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উত্তুঙ্গ সমুদ্রস্রোতের মাঝে জার্মানির ডুবোজাহাজ থেকে জাপানি ডুবোজাহাজে একজন অসামরিক ব্যক্তির স্থানান্তরের উদাহরণ এক বিরল ঘটনা—নেতাজীর এই অদম্য সাহস ও ত্যাগ তাঁর প্রতিটি বক্তব্যে ফুটে উঠতো। জাপানে প্রতিক্ষারত রাসবিহারী বসু জানতেন, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, কষ্টসহিষ্ণু এইরকম নেতাই পারেন বিদেশের মাটিতে যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে সেনাবাহিনী গড়তে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের এই অতিমানবীয় ঘটনাগুলি কবিগুরুর এই পঙ্‌ক্তিগুলি দিয়ে ব্যক্ত করা যেতে পারে—

'যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।'

নেতাজী প্রথমবারের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর যে Planning Commission তৈরি করেছিলেন তা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়ে 'নীতি আয়োগ' রূপে বর্তমান যা ভবিষ্যৎ ভারত গঠনে নেতাজীর দূরদর্শিতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। নেতাজী বিশ্বসভ্যতায় ভারতবর্ষের যে 'mission' সফল করতে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন তার বাস্তবায়নের প্রাথমিক শর্ত নেতাজীর 'ভারতবোধ' ও আদর্শের উপলব্ধি।

তথ্যসূত্র ঃ

১। The Indian Struggle–Subhas Chandra Bose, ২। ভারত পথিক—সুভাষচন্দ্র বসু, ৩। তরুণের স্বপ্ন—সুভাষচন্দ্র বসু, ৪। তরুণের আহ্বান—সুভাষচন্দ্র বসু, ৫। আমি সুভাষ বলছি—শৈলেশ দে

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

ভারতের কাছে নতজানু পাকিস্তান

দিগন্ত চক্রবর্তী

সম্প্রতি ভারতের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। বলা যেতে পারে ভারতের কাছে নতজানু পাকিস্তান। স্বামীজীর কথায়, 'ভারত আবার উঠবে, জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে। বিনাশের বিজয়পতাকা নিয়ে নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা নিয়ে— সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ সহায়ে।'

ভারতের সঙ্গে আর যুদ্ধ চায় না পাকিস্তান! রীতিমতো শান্তি প্রস্তাব পাঠিয়ে এহেন ঘোষণা করেছেন পড়শি দেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে পাকিস্তানের যে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে সেটাও তিনি মেনে নিয়েছেন। পাক প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে কথা বলতে চান। স্বাধীনতার পর থেকে বারবার ভারতের বিরুদ্ধে নানাভাবে আক্রমণ করেছে পাকিস্তান। বারবার দখল করতে চেয়েছে কাশ্মীর। আর সেই দেশই কিনা এখন শান্তির প্রস্তাব দিচ্ছে! যা বেশ অবাক করার মতোই। কিন্তু কী এমন হলো যে কাশ্মীরের আজাদি চাওয়া পাকিস্তান ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য চাইছে?

যদি স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তানের ইতিহাসের দিকে চোখ রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ জন্ম হওয়ার পর থেকে কখনোই পাকিস্তানে রাজনৈতিক সুস্থিতি ছিল না। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হয়েছিল জন্ম হওয়ার ২৩ বছর পর ১৯৭০ সালে। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ২৯ জন প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছে পাকিস্তান, তার মধ্যে কেউই তার পুরো মেয়াদ শেষ করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, আঠারো বার দেশের প্রধানমন্ত্রীকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারোর উপর লাগানো হয়েছে দুর্নীতির আরোপ, কারোর উপর আরও অন্যান্য অভিযোগ। সম্প্রতি ইমরান খান যিনি পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেনও বটে, তাকেও প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দেশবাসীর মনে নতুন পাকিস্তানের ধারণা দিয়ে যিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন, সেই নতুন পাকিস্তানই এখন নতুন অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। কারণ সরকার বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সরকারের নীতিগুলিও বদলায়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আগের সরকারের দোষ তুলে ধরার জন্য সেই সরকারের ভালো নীতিগুলোও বদলে ফেলে নতুন সরকার। আগের সরকারের বিপরীতে অবস্থান করতে গিয়ে নিজেরাই সমস্যার সৃষ্টি করে। সৃষ্টি হয় এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের।

বিগত কয়েক বছর ধরে পাকিস্তানের জাতীয় আয়ের তুলনায় ব্যয় অনেক বেশি বলে

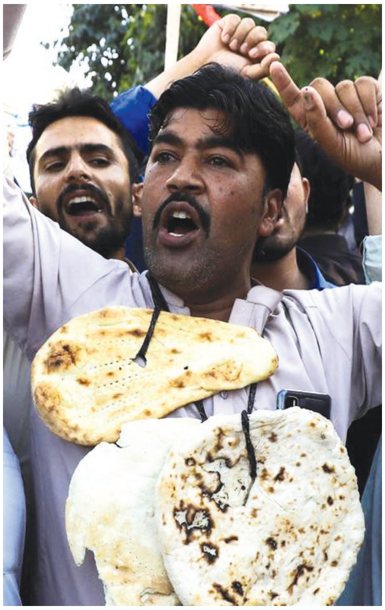

তথ্য দিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক। তাদের তথ্য অনুসারে পাকিস্তানের বার্ষিক আয় ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩ শতাংশ। অপরদিকে পাকিস্তান ৩০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে আর আমদানির পরিমাণ তার প্রায় তিনগুণ ৯০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। যার ফলে এক বিরাট অঙ্কের ঘাটতি। পাকিস্তানের বার্ষিক বাজেটের একের তিন শতাংশ ঋণ মেটাতেই চলে যায়। বিগত তিন মাসে পাকিস্তানকে ৮ বিলিয়ন ডলার শোধ করতে হবে কিন্তু পাকিস্তানের এখন রয়েছে মাত্র ৫.৮ বিলিয়ন ডলার।

একদিকে মানুষ খেতে পাচ্ছে না, এক বাটি আটার জন্য মানুষকে রাস্তায় নেমে ভিক্ষা করতে হচ্ছে, অপরদিকে সরকারের ওপর বিরাট ঋণের বোঝা। বর্তমানে পাকিস্তানে একটি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ১০ হাজার টাকা। উন্মত্ত জনতাকে সামাল দিতেও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে যে জঙ্গিবাদকে তারা মদত দিয়ে এসেছে, মানুষের মনে যে উগ্রবাদ তারা তৈরি করেছে সেটাই এখন তাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক কথায় যে লাঠিতে তারা তেল মাখিয়েছে সেই লাঠিই আজ তাদের পিঠে পড়ছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ভারতের বিরুদ্ধে তিন-তিনটি যুদ্ধ পাকিস্তানের দেউলিয়া হবার একটি অন্যতম কারণ হিসেবে মেনে নিয়েছে সে দেশেরই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। যুদ্ধের ফলে যেমন বেড়েছে দারিদ্র্য, অন্যদিকে দেখা দিয়েছে বেকার সমস্যা। সর্বোপরি বর্তমান ভারত সরকারের বিদেশনীতি তথা নানা কূটনৈতিক নীতির ফলে একঘরে হয়ে গেছে পাকিস্তান। বিশ্বের সমস্ত তাবড় তাবড় দেশ যেখানে বর্তমানে ভারতের বন্ধু, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের নাম ক্রমশই ডুবছে।

কয়েক বছর আগেও যারা কাশ্মীরের দাবি করত, এখন একমুঠো আটার জন্য রাস্তায় নেমে ভিক্ষে করছে। মানুষ না খেতে পেয়ে অভাবে অনটনে বিক্ষোভ করছে আর সেই বিক্ষোভ থামানোর জন্য তথা দেশের সুস্থিতির জন্য পাকিস্তান সরকার সাহায্য চাইছে ভারতের কাছে। সেই ভারত যাদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে তারা নাশকতা চালিয়ে এসেছে। ▯

গণতন্ত্রের প্রধান প্রহরী দেশের মানুষ

মণীন্দ্রনাথ সাহা

দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেখতে দেখতে কেটে গেল পঁচাত্তরটা বছর। চুয়াত্তর বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি গৃহীত হয়েছিল ভারতের সংবিধান। সেদিন সংবিধান রচনা এবং তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব দেশের সাধারণ মানুষের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। চুয়াত্তর বছর সময়টা খুব কম নয়। চুয়াত্তর বছরে দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে ছবি দেখতে পাওয়া যায় তা পূর্ণ সাফল্যলাভ না করলেও আশাপ্রদ বলা যেতেই পারে।

ভারত স্বাধীন হওয়ার আগেই গঠিত হয়েছিল নির্বাচিত গণপরিষদ। ওই পরিষদ ১৯৪৭ সালের ২২ জানুয়ারি যে সংকল্প গ্রহণ করেছিল, তাতে বলা হয়েছিল, ভারতকে এক সার্বভৌম গণরাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার জন্য এবং তার ভাবী শাসনের প্রয়োজন এক সংবিধান রচনা করার জন্য এই গণপরিষদ তার দৃঢ় ও সত্যনিষ্ঠ সংকল্প ঘোষণা করছে।

এই ঘোষণার পর স্বাধীন ভারতে সংবিধান রচিত হলো ও বলবৎ হলো। এই বলবৎ হওয়ার দিনটি ছিল ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ সাল। সংবিধানের প্রস্তাবনা বাক্যটি হলো, 'আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক গণরাজ্যরূপে গড়ে তোলার জন্য সত্যনিষ্ঠ ভাবে সংকল্প করে এই সংবিধান গ্রহণ করেছি।'

এই কথাগুলিকে কোনও ভাবে উপহাস করা যাবে না। বরং বলতেই হবে, ভারতের জনগণই এই গণরাজ্য তথা সাধারণতন্ত্র নিজেদের উপহার দিয়েছে। সেজন্যই ভারতের গণতন্ত্র বিশ্বে লাভ করেছে অনন্য প্রতিষ্ঠা। একে নাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। সংবিধানের বিভিন্ন ধারার সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন হতে পারে। কিন্তু সাধারণতন্ত্রকে উৎখাত করা যাবে না।

ভারতের সাধারণতন্ত্র মানুষকে এটুকু বুঝতে দেয় যে, এই দেশ তাদের। দেশের ভালো-মন্দ-তাদেরই ভালো-মন্দ। সমাজে ধনী-দরিদ্রের ভেদ আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সামাজিক গতিশীলতাও আছে। খুব সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েরাও সমাজের, দেশের শীর্ষে আরোহণ করতে পারছে। প্রাক্তন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী কিংবা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকেই আছেন যাঁরা প্রত্যেকেই অতি সাধারণ অবস্থা থেকে নিজেদের শিক্ষা, মেধা, কর্মের ভিত্তিতে এই গণতন্ত্রের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেছেন। বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কথা এখানে না বললেই নয়। তিনি নিজের শিক্ষা, মেধা, বুদ্ধি, প্রচণ্ড পরিশ্রম ও কর্মনৈপুণ্যের সুবাদে ভারতীয় গণতন্ত্রের সিঁড়ি বেয়ে যোগ্যস্থানে আরোহণ করেছেন।

সাধারণতন্ত্র জনগণের আত্মবিকাশের রাস্তা খুলে দেয়। দেশের উন্নয়নের সেটাই চাবিকাঠি। প্রতিটি মানুষের মধ্যে সৃজনপ্রতিভা রয়েছে। যত তার স্ফুরণ হবে তত দেশ এগোবে, সমাজ সমৃদ্ধ হবে। সাধারণতন্ত্র জনগণকে বিকাশমুখী করে, তাদের অবরুদ্ধ সৃজনশক্তিকে মুক্তি দেয়। তা যদি না হতো তাহলে ১৯৪৭ সাল ও ২০২৩ সালের ভারতের মধ্যে পার্থক্য ঘটল কীভাবে?

আজ ভারতীয় গণতন্ত্র যখন ৭৪ বছরে পড়ছে, তখন আমরা পিছনে তাকিয়ে দেখি কতদূর এগিয়েছি। কৃষিতে, শিল্পে, সমাজ-কল্যাণে, খাদ্যের নিরাপত্তায়, দুর্বল ও উপজাতিদের যত্নে দেশ ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছে। জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা আকাশে হাত বাড়াতে কোনও বাধার তোয়াক্কা করেনি। মহাসমুদ্রের গভীরে ঝাঁপ দিয়েছে এবং আইটি ক্ষেত্রে নতুন নতুন উচ্চতায় পৌঁছে বিশ্বজুড়ে সফট্ওয়্যার পাওয়ারহাউস নামে অভিহিত হয়েছে।

এই সবকিছুই সম্ভব হয়েছে তার কারণ বর্তমান ভারত জনশক্তিকে মুক্ত করে দিয়েছে। ভারতীয় গণতন্ত্র সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বমূলক এবং তৃণমূল স্তর পর্যন্ত অংশগ্রহণমূলক রূপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। সংবিধান স্থাপিত সেইসব মহান আদর্শকে পূরণ করছে— ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শকে যা আমাদের গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি।

সাধারণতন্ত্র দিবসে আমাদের সৈনিকরা যখন জনগণের হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে কুচকাওয়াজ করেন, ট্যাবলোগুলো যখন বিভিন্নতা তার ঐক্যকে দেখায়, তখন গর্বে দেশবাসীর বুক ভরে ওঠে। আমরা নেতিবাদীদের ভুল প্রমাণ করেছি। গণতন্ত্র আর উন্নয়ন সহাবস্থানই করে।

মতামত প্রকাশের অধিকার কি মিথ্যা?

তোমার যা অধিকার, আমার তা নয় কেন? দেশের সংবিধান মতামত প্রকাশের অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করে। তাহলে আজ এত বিতর্ক কীসের? কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন সমাজের বড়ো পদে থেকে যা খুশি বলা যায় না। অবশ্যই তাদের আঙুল নূপুর শর্মার দিকেই। নূপুর শর্মা কি এই প্রথম এধরনের আচরণ করলেন? না। তা ঠিক নয়। নূপুর শর্মা ঠিক না ভুল, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। বিতর্কে আসার আগে দেখা দরকার বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা এর আগে কি কি মতামত দিয়েছেন।

(ক) মমতা, সোনিয়া, অখিলেশ, লালু, স্ট্যালিন বামপন্থী সমেত বিজেপি বিরোধী দলের মুখে একই কথা, "সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললেই মোদী সরকার সঙ্গে সঙ্গে সিবিআই বা ইডি লাগিয়ে দিচ্ছে।" আজ এখানে সিবিআই বা ইডির নিযুক্তি ঠিক কি ভুল তা আলোচনা করব না। শুধু বলব এই সব নেতা-নেত্রীরা শুধু মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার কথাই বলতে চেয়েছেন।

(খ) দায়িত্বশীল পদে থেকে কে কী বলেছেন বা করেছেন–

মমতা ব্যানার্জী প্রধানমন্ত্রীকে তুই-তোকারি করেছিলেন। তিনি কথায় কথায় বাঙ্গলার সংস্কৃতির কথা বলেন। আপনারা কী মনে করেন এটাই বাঙ্গলার সংস্কৃতি? প্রধানমন্ত্রীকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাবেন! সায়নী ঘোষ শিবলিঙ্গে কন্ডোম পরানোর কথা বলেন। কই তার দলের নেত্রীর কুমন্তব্যের জন্য মমতা ব্যানার্জী ক্ষমা চাননি তো। উল্লেখ্য এই ঘটনার পর সায়নী ঘোষের পদোন্নতি হয়।

মকবুল ফিদা হুসেন একজন শিল্পী। তিনি মা সরস্বতীর নগ্ন ছবি এঁকে তার প্রদর্শনী করার সাহস দেখাতে পেরেছেন। সেদিন বিজেপি-শিবসেনা বিক্ষোভ দেখালেও আজ যারা বিজেপি বিরোধী তারাই সেদিন শিল্পীর স্বাধীনতার জন্য আওয়াজ তুলেছিল। অবশ্য এরা সংখ্যালঘুদের দোষ দেখতে পান না। তাই তসলিমা নাসরিন লেখিকা হয়েও, মোল্লাবাদীদের আক্রমণের শিকার হওয়ার নূপুর শর্মার তাঁর সমর্থনে কোনও কথা বলেনি। কী সেই অজ্ঞাতকারণ? তাহলে যত দোষ সব নূপুর শর্মার? তাঁর ফাঁসি চাই। কেন? তিনি কী নিজের মনগড়া কথা বলেছেন? সত্যি সত্যি যদি তা প্রামাণ্য তাহলে তা বাতিল করা হোক বলে দাবি করা হচ্ছে না কেন? সবার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে।

শুধু নূপুর শর্মার থাকলেই দোষ। আর এই কারণেই কী করে পশ্চিমবঙ্গ সমেত দেশের বিভিন্ন স্থানে একই কায়দায় সংগঠিতভাবে বিরোধের নামে সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করা হয়। অন্য রাজ্য সরকার দুষ্কৃতীদের কড়া হাতে দমন করলেও পশ্চিমবঙ্গের সরকার যতটা রাজনৈতিক আন্দোলনে বা চাকুরির দাবিতে আন্দোলনরত মানুষের উপর দমন-পীড়ন চালান, এক্ষেত্রে তার সামান্যতম অংশও দেখাতে পারেনি। কেন?

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারিডাঙ্গা, হাওড়া-৯

এই রাজ্য আর কত নীচে নামবে

আদালতে এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুগত আইনজীবীরা যেভাবে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে হামলা ও বয়কট করল তা শুধু অনভিপ্রেত নয়, নজিরবিহীনও বটে। সেইসঙ্গে তার ঠিক আগের দিন রবিবার বিচারপতির পাড়া-সহ কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বিচারপতির ছবি দিয়ে পোস্টার লাগানো হয়েছে তা সমাজের সর্বস্তরে ধিকৃত হয়েছে। রাজ্যের শাসকদল এর দায় নিতে অস্বীকার করলেও সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার এসবের পিছনে কাদের হাত আছে। এই বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব দ্বিবিধ। প্রথমত, প্রশাসন ঘটনার চারদিন পরেও অপরাধীদের ধরতে অপারগ। সিসিটিভি ফুটেজে বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মিডিয়ায় দুষ্কৃতিদের ছবি প্রকাশিত হলেও পুলিশ কেন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না। এটা একপ্রকার পুলিশ তথা প্রশাসনিক অপদার্থতা। দ্বিতীয় কারণ হলো শাসকদল গত বছর থেকেই বিভিন্ন দুর্নীতির মামলায় জেরবার। শিক্ষা, বালি, পাথর, আবাস যোজনা-সহ একাধিক মামলায় সরকার-সহ দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নেতা, মন্ত্রী ও সরকার নিযুক্ত আমলারা জেলে। সরকারপক্ষের আদালত,বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকরীদের সাঁড়াশি চাপে নাভিশ্বাস শুরু। এই অবস্থায় দেশের শীর্ষ আদালতেও আবেদন- নিবেদন করে কোনও সুরাহা হচ্ছে না। এমনকী দেশের শীর্ষ স্থানীয় আইনজীবী নিয়োগ করেও ফল পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থ অপচয় করে ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

তাই বিনাশকালে বুদ্ধি নাশ হয়েছে রাজ্য সরকারের। আসলে বাঙ্গলার এই অবক্ষয়ের শুরু আজ নয়। আদালত, বিচারপতিদের ওপর গালিগালাজ শুরু সেই বাম জমানায়। আজও বাঙ্গালির মনে পড়ে বিচারপতি লালার উদ্দেশে বামেদের সেই কটাক্ষ। আসলে গত ৮ ও ৯ জানুয়ারির ঘটনাক্রম তৃণমূল দলের ও সরকারের হতাশার পরিণতি। আসল কথা হলো একটা দল বিপাকে পড়ে সামগ্রিকভাবে তার নানা কু-যুক্তি গ্রহণ করছে আগাপাশতলা না ভেবে। তৃণমূলের আজকের পরিস্থিতি মনে করায় ১৯৭৫ সালের ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে ওঠার কাহিনী। সেই সময় সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কুপরামর্শে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন এবং তার পরিণতি আমরা জানি। তৃণমূল এই পোস্টার-সহ বিচারপতির আদালত বয়কট ও আদালত অবমাননার দায় নিতে রাজি না হলে কী হবে। অনেকেই পরপর দু'দিনের ঘটনা স্বাভাবিক ভাবেই সমাপতন হিসেবে দেখছেন। কারণ তৃণমূল বারবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে হেনস্থা করতে চাইলেও পারছে না এবং ভাইপো, শ্যালিকাকে

রক্ষাকবচ দেননি বিচারপতি মান্থা। তাই দল ও সরকার সমস্ত রাগ ও উষ্মা উগড়ে দিয়েছে দু'দিনের ঘটনায়। পরিশেষে বলতেই হয় এই দুটি ঘটনা কিন্তু তৃণমূলের লাভের থেকে বেশি ক্ষতিই করেছে। যিনি এই ঘটনার পরামর্শদাতা তিনি দলের মিত্র থেকে শত্রু বেশি, কারণ এই ন্যক্কারজনক ঘটনা বিচারব্যবস্থাকে আরও সাহসী করে তুলবে শাসকদল ও সরকারের বিরুদ্ধে।

—**তারক সাহা,**
হিন্দমোটর, হুগলী।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সংবাদ সংগ্রহ

না, হিন্দুরা ঠিক করেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তারা কোনও সংবাদ সংগ্রহ করবে না। অতীতে যা কিছু ঘটেছিল অদূর ভবিষ্যতে সেটা যে আবার ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে হিন্দুরা আদৌ চিন্তিত নয়। খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো, গান-বাজনা,ফূর্তি নিয়ে তারা বড়োই ব্যস্ত। হিন্দুরা এখনও বিশ্বাস করে বিপদের সময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটবে আর তিনিই অত্যাচারীদের দমন করবেন ও অত্যাচারিতদের রক্ষা করবেন। সুতরাং খাও পিও জিও ফূর্তি করো। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উলটে লাভ কী?

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

হিন্দু মুসলমান পারস্পরিক আলোচনা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ

সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, সেটি হলো প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশি, দিল্লির প্রাক্তন উপরাজ্যপাল নাজিব জঙ্গ-সহ পাঁচজন বিশিষ্ট মুসলমান ব্যক্তিবর্গের ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক পরম পূজনীয় মোহন ভাগবতজীর সাক্ষাৎকার। সংবাদপত্রে জানা যায়,গত ২২ আগস্ট দিল্লিতে মিলিত হয়ে ভাগবতজী হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য, পারস্পরিক অবিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু, বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ও সঙ্ঘের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় বিশ্বে ইন্দোনেশিয়ার পরে ভারতবর্ষে মুসলমানদের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তাই, 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর আদর্শকে সামনে রেখে এই বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে সনাতন হিন্দু সমাজের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত। কারণ মোহনজী বারংবার বলেছেন, সকল ভারতবাসীর ডিএনএ একই অর্থাৎ উপাসনা পদ্ধতি আলাদা হলেও আমরা সকলেই হিন্দু। সেজন্য পারস্পরিক অনৈক্য, মোল্লাবাদী মানসিকতা ও অবিশ্বাস দূর করতেই উপরোক্ত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ভাগবতজী সাক্ষাৎ করেন।

সংবাদপত্রে প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার কুরেশি জানিয়েছেন, এক ঘন্টার আলোচনায় মূলত হিন্দু-মুসলমান সমাজের অবিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু নিয়ে সদর্থক আলোচনা হয়েছে। তিনি জানান, ভাগবতজী দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। একটি হলো গোহত্যা নিষিদ্ধকরণ। কারণ হিন্দুদের কাছে শ্রদ্ধার কেন্দ্র হলো গোমাতা। যার হত্যা কখনোই হিন্দুরা মানতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কোরানে অমুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত 'কাফের' শব্দটি নিয়ে ভাগবতজী যথার্থই আপত্তি জানিয়েছেন। এই শব্দটি হিন্দুদের কাছে আপত্তিজনক ও অবিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুসলমান বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও 'মুসলমান মাত্রই পাকিস্তানি ও জিহাদি' হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার প্রবণতাকে আলোচনায় উল্লেখ করেছেন বলে জানা যায় এবং তার ফলে মুসলমান সমাজের মধ্যে নাকি ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেছেন। এ বিষয়ে উভয়পক্ষ নিজেদের মতামত বিনিময় করেছেন। যেকোনও বিষয়ে নিরন্তর আলোচনাই যে একমাত্র সমাধান তা উভয়পক্ষ একমত হয়েছেন। পরবর্তীকালে এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবার জন্য মুসলমান ব্যক্তিদের অনুরোধে ভাগবতজী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে চারজনের একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন এবং প্রয়োজনে নিজেও উপস্থিত থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্বাধীনতার পরে এই ধরনের কোনও ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই ধরনের আলোচনা সমস্যা সমাধানে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তবে এই সদর্থক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল এইসব মুসলমান ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং পূজনীয় ভাগবতজীর হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তার জবাবে এস ওয়াই কুরেশি জানিয়েছেন, আরএসএস হলো বর্তমান বিশ্বের একটি সর্ববৃহৎ হিন্দু সংগঠন। সুতরাং তার সর্বভারতীয় প্রধানের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই যে ইতিবাচক সাফল্য আসবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এটাই হলো সঙ্ঘ কাজের স্বীকৃতি এবং সঙ্ঘ সম্পর্কে সমাজের ধারনা। আরও উল্লেখ্য মিঃ কুরেশি ভাগবতজীর নিয়মানুবর্তিতা, স্বভাবসিদ্ধ আচরণ, সাধারণ জীবনযাপন ও আন্তরিক ব্যবহার দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি নির্ধারিত ঠিক দশটায় আলোচনায় ভাগবতজীর উপস্থিতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আজ প্রমাণিত মুসলমান সমাজের কাছে সঙ্ঘই হিন্দু সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি এবং সঙ্ঘের ভূমিকা সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই তারা মনে করেন।

—**আনন্দমোহন দাস,**
উত্তরপাড়া, হুগলী।

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

কাণ্ডারি যখন মাতৃশক্তি

সুতপা বসাক ভড়

জীবন যেন রামধনুর মতো নানান রং দিয়ে সাজানো। পথ চলতে চলতে কখনও মধুর আবেগে বিভোর হয়ে অনেকটা সময় কেটে যায়, আবার কখনও বা বিষম পরিস্থিতির সামনে পড়তে হয়। তখন সময় যেন বড়ো কঠিন, দীর্ঘায়িত হয়ে ওঠে। আবার কখন যেন চাকা ঘুরে যায়—'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।' পৃথিবীতে কোনো কাজই ছোটো বড়ো হয় না। যে কাজ করে শান্তি পাওয়া যায় এবং যার দ্বারা সংসার চলে, জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য সেইরকম কাজ করা যেতে পারে। অন্তত কারুর কাছে দয়া ভিক্ষা করতে হয় না। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মিউনিসিপ্যালিটি ঘাটভাউর গ্রামের বাসিন্দা রিঙ্কু রায় নৌকা বেয়ে নিজের পরিবারের ভরণপোষণ করেন। রিঙ্কু তাঁর শ্বশুর অমল কৃষ্ণ রায়ের কাছ থেকে নৌকা বাওয়া শেখেন। তাঁর শ্বশুর তাকে নৌকা বাইবার প্রশিক্ষণ দেন। তারপর তিনি করোনার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হঠাৎই তাঁর ব্রেন স্ট্রোক হয়। এই পরিস্থিতিতে সংসার চালানো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তখন রিঙ্কু নৌকা বেয়ে উপার্জন করা শুরু করেন। এখন তার শ্বশুর বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর শিক্ষা, তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে আর্থিক দিক থেকে সাহায্য করেছে। গ্রামের অন্যান্য ঘাটে পুরুষেরা নৌকা বাইলেও বনগাঁর হরিতলা নতুনগ্রামে রিঙ্কু যাত্রী পারাপার করে থাকে। এই সাহসিক কাজের জন্য তিনি সম্মানিতও হয়েছেন।

পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন রিঙ্কু, তিনি জানান যে প্রথম দিকে লোকজন মহিলা মাঝি বলে তার নৌকায় বিশেষ বসতো না; কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। লোকজন স্বাভাবিক ভাবেই তার নৌকায় নদী পারাপার করে। করোনার সময় নৌকা চালানোর উপার্জনেই তাঁর সংসার চলেছে। নৌকার ভাড়া জনপ্রতি তিন টাকা। সাইকেলসহ পাঁচ টাকা। তবে করোনার সময় তিনি টাকা না নিয়েও অনেককে পারাপার করেছেন। আর্থিক দিক থেকে দুর্বল পরিবারের একটি মেয়ে এইভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

নৌকা চালিয়ে প্রতিদিন ২৫০–৩০০ টাকা আয় করেন। সকাল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত রিঙ্কু নৌকা পারাপার করেন। মাঝে অল্প একটু সময়ের জন্য বাড়ি গিয়ে সংসারের কাজও করে আসেন। রিঙ্কুর স্বামী গোবিন্দ রায় টোটো ভাড়া নিয়ে চালান। তিনি বেশি লেখাপড়া শেখেননি, তবে নিজেদের দুটি সন্তানকে পড়াশুনা শিখিয়ে মানুষ করে তোলা তাঁদের স্বপ্ন।

আপাতদৃষ্টিতে রিঙ্কু একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের পুত্রবধূ, যিনি কঠিন পরিস্থিতিতে সংসারের হাল ধরেছেন। তবে, তার চরিত্রের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমী গুণাবলীর সমন্বয় আমরা দেখতে পাই। প্রথমত, তিনি তার শ্বশুরকে সাহায্য করেছেন নৌকা বাইবার ক্ষেত্রে। তাঁর থেকে নৌকা বাওয়া শিখে নেন। একটি অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত অথচ প্রয়োজনীয় বিদ্যা সে আয়ত্ত করে। করোনাকালে তিনি এই বিদ্যাকে কাজে প্রয়োগ করে সংসার চালানোর সহযোগিতা করেন। আবার তার মধ্যে মানবিক দিকটিও বিশেষভাবে নজরে পড়ে। ওই বিশেষ স্থিতিতেও সে অনেকের থেকেই পারাপারের পয়সা নেননি। বর্তমানে তিনি সংসার চালাচ্ছেন ওই নৌকো বেয়ে—কাণ্ডারির ভূমিকায়। রিঙ্কুর মতো মেয়ে এইভাবেই একটি প্রাচীন বিদ্যাকে আয়ত্ত করে তার মাধ্যমে সংসারের হাল ধরেছেন। এইরকম মাতৃশক্তি আমাদের আশা, আমাদের গৌরব। ◻

'অঙ্গনা' বিভাগের জন্য লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
বিষয় : নারী ক্ষমতায়ন, বর্তমান ভারতে নারী সমাজের অগ্রগতি, দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মাতৃশক্তি, নারী শক্তির উত্তরণের কাহিনি, রত্নগর্ভা মা ইত্যাদি নারী জাগরণের যে কোনও দিক। যা ভারতীয় নারী সমাজের কাছে ইতিবাচক বার্তা দিতে সক্ষম।
ওয়ার্ড ফাইল অথবা পিডিএফ পাঠাতে পারেন। হাতে লেখা কপি স্ক্যান করে পাঠাবেন।
যোগাযোগ ঃ স্বস্তিকা সম্পাদকীয় বিভাগ,
মোবাইল-৮৪২০২৪০৫৮৪

বিঃ দ্রঃ- অঙ্গনা বিভাগে শুধুমাত্র মহিলা লেখকদেরই লেখা প্রকাশিত হয়।

চোখ যখন মাথা ব্যথার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

চোখের আঘাত, চোখের মাংসপেশির সমস্যা, চোখের উচ্চচাপ, চক্ষুগোলকের নিজস্ব সমস্যা এরকম বহু কারণ থাকতে পারে মাথাব্যথার কারণের পিছনে। চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধির।

মাথাব্যথা নিজেই অনেক সময় আমাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাথাব্যথার অনেক কারণ থাকতে পারে যা লিখতে গেলে কলম-কাগজ সব ফেল মেরে যাবে। তবে যেসব সমস্যায় মাথাব্যথা হয় সাধারণত তার মধ্যে চোখের সমস্যার কারণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সংক্ষেপে দেখে নেব চোখ কীভাবে মাথাব্যথার কারণ হয়।

চক্ষু গোলকের নিজস্ব রোগ বলতে সাধারণত ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক জনিত মাথাব্যথার সঙ্গে চোখের ব্যথা থাকবে। কখনো কখনো তীব্রতা মাথাব্যথাকে ছাড়িয়ে যায়। মাথা ধরা পাশাপাশি চোখ লাল হওয়া, ফুলে যাওয়া বা চোখে জল পড়া ইত্যাদি । বেশ কিছু সংক্রমণ হলো যেমন, চোখের পাতার রোমকূপের সংক্রমন, কর্নিয়ার সংক্রমন ঘা, নেত্রনালির ইনফেকশন, চোখে কোনো বস্তু পড়া ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে চোখের ওইদিকের মাথাব্যথা থাকতে পারে, তবে চোখের উপসর্গগুলোই প্রধান।

চোখের উচ্চচাপ বা গ্লুকোমা ঃ গ্লুকোমা অনেক রকমের হয়। কিছু কিছু গ্লুকোমার ধরন রয়েছে সেখানে চোখ প্রচুর ব্যথা হয়, চোখ লাল হয়ে যায়, ঝাপসা হয়ে যায় ইত্যাদি। গ্লুকোমার আক্রমণে চোখের দিকের মাথার অংশেও ব্যথা হয়। ব্যথাটা প্রচুর, সঙ্গে বমিও হয় সাধারণত অনেক সময় এই ধরনের গ্লুকোমার রোগী মেডিসিন বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হয় মাথাব্যথা আর বমি নিয়ে। বিচক্ষণ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ নিজেই চোখের সমস্যা ধরে ফেলতে পারেন, তখন তিনি রোগীকে পাঠিয়ে দেন চক্ষু চিকিৎসকের কাছে। আরেক ধরনের গ্লুকোমা আছে যেখানে চোখে ঝাপসা, লাল বা ব্যথা কিছুই নেই, শুধু চশমার প্রতি অসহনশীলতা দেখা যায়, নতুন চশমা নিলে কিছুদিন ভালো চলে, পরে একটু ঝাপসা হয়ে আসছে আর একটু একটু মাথাও ব্যথা হচ্ছে, ব্যথাটা হচ্ছে মাথার সামনের দিকে, কপালের ওপরে, বিশেষ করে কোনোকিছু মনোযোগ দিয়ে পড়ার সময়। চিকিৎসক চশমা পাল্টে দেন, কিন্তু কিছুদিন পর আবার তথৈবচ। এমন অবস্থায় চোখের উচ্চচাপের কথাটি বিশেষজ্ঞের মাথায় থাকা উচিত।

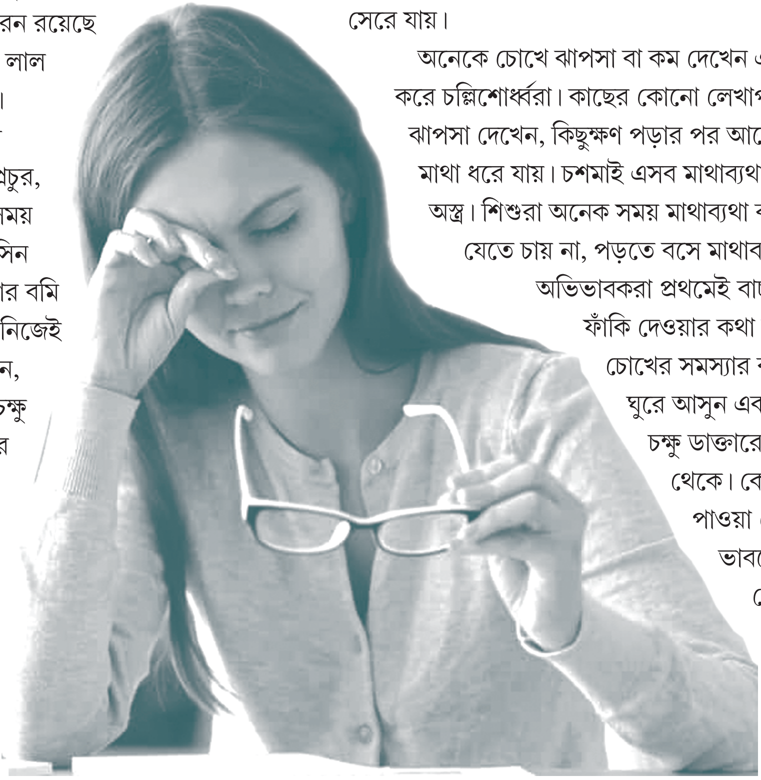

চোখের আঘাত ঃ চোখের যে কোনো ধরনের আঘাত তা সে ধারালো বস্তু দিয়েই হোক বা ভোঁতা শক্ত বস্তু দিয়েই হোক, চোখ এবং চোখের দিকে মাথার অংশে ব্যথা হবে। চোখে কোনো বস্তু (ফরেন বডি) পড়লে তা থেকেও চোখ এবং মাথাব্যথা হয়।

চোখের পাওয়ারজনিত সমস্যা ঃ অনেক ক্ষেত্রে চোখের পাওয়ারের সমস্যা প্রকাশ পায় মাথাব্যথা নিয়ে। সাধারণত মাথার সামনের দিকে কপালের উপরিভাগে এবং দুদিকে ব্যথা হয়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আস্তে আস্তে সকাল পেরিয়ে দিন যত গড়ায় কাজের ব্যস্ততা যত বাড়ে মাথাব্যথা আস্তে আস্তে তত মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে সঙ্গে একটু বমি বমি ভাব অথবা মাথা ঘুরানো। উপসর্গ দিনের শেষভাগে বাড়ে। রাতে ঘুমিয়ে সকালে উঠে আবার ভালো। আবার দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথাব্যথাও জেগে ওঠে। তবে সপ্তাহান্তে ছুটির দিন স্কুলে পড়া নেই, অফিসের ফাইলে নেই মাথাব্যথা। এইসব ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সঙ্গে ধৈর্য্য ধরে রোগীর সমস্যা শুনলে ডাক্তার বিষয়টি ধরে ফেলবেন। চশমা নিয়ে অনেক সময় এই মাথাব্যথা সেরে যায়।

অনেকে চোখে ঝাপসা বা কম দেখেন এবং বিশেষ করে চল্লিশোর্ধ্বরা। কাছের কোনো লেখাপড়ার সময় ঝাপসা দেখেন, কিছুক্ষণ পড়ার পর আস্তে আস্তে মাথা ধরে যায়। চশমাই এসব মাথাব্যথার মোক্ষম অস্ত্র। শিশুরা অনেক সময় মাথাব্যথা বলে, স্কুলে যেতে চায় না, পড়তে বসে মাথাব্যথায় কাঁদে, অভিভাবকরা প্রথমেই বাচ্চার পড়ার ফাঁকি দেওয়ার কথা না ভেবে চোখের সমস্যার কথা ভাবুন, ঘুরে আসুন একবার কাছের চক্ষু ডাক্তারের কাছ থেকে। কোন কিছু না পাওয়া গেলে আপনি ভাবতে পারেন যা ভেবেছিলেন। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসূ। ◻

ভারতকে ভাঙতে গিয়ে পাকিস্তান নিজেই ভাঙনের দোরগোড়ায়

সুদীপ্ত গুহ

১৯৯১ সালে ভারত যখন প্রায় দেউলিয়া হওয়ারপথে তখন পাকিস্তানের মানুষের গড় আয় ভারতের চেয়ে বেশি। ঠান্ডা যুদ্ধের পতনের সময় আসন্ন। ভারতের বন্ধু সোভিয়েত পতনের মুখে। অপরদিকে পাকিস্তানের বন্ধু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়রের মাথায় ঠান্ডা যুদ্ধের জয়ের মুকুট। পাকিস্তান ভারতকে অনেকটা পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। এর আগে আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্বকালে আমেরিকা পাকিস্তানকে ব্যবহার করে সোভিয়েত, আফগানিস্তান, ইরান ও ভারতের মতো শত্রুর বিরুদ্ধে। সোভিয়েতপন্থী আফগানিস্তানে সৈন্য না পাঠিয়ে পাকিস্তানের মাটিকে উগ্রপন্থী প্রশিক্ষণ থেকে গেরিলা যুদ্ধের মহড়ার কাজে লাগায় আমেরিকা। প্রচুর আয় বাড়তে থাকে পাকিস্তানের সেনার।

প্রসঙ্গত, পাক সেনা কিন্তু অন্য দেশের মতো নয়। ওই দেশে ব্যবসা, মিডিয়া থেকে খেলা সব চালায় মিলিটারি। পাকিস্তানে টাটা, বিড়লা, আদানি, আম্বানি নেই। সব মিলিটারি। দিনে দিনে আমেরিকা যত উগ্রপন্থী প্রশিক্ষণ এবং লজিস্টিক্স হাব হিসেবে পাকিস্তানের মাটি ব্যবহার করতে শুরু করল, বাড়তে থাকলো পাকিস্তানি মিলিটারির ক্ষমতা। আফগানিস্তান থেকে ১৯৯৬-এ সোভিয়েত বিদায় নিলে তালিবানরা ক্ষমতায় আসে। কিন্তু ২০০১ সালে সেই তালিবান আমেরিকা আক্রমণ করলে, আফগানিস্তান দখল করতে আমেরিকা পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। পাকিস্তানও আমেরিকার থেকে আরও অর্থ নিতে থাকে এবং পুরোটাই দেশের উন্নয়নের কাজে না লাগিয়ে মিলিটারি ও রাজনৈতিক নেতাদের পকেটস্থ হয়।

এই দশ বছর অর্থাৎ ১৯৯১-২০০১ ভারত ঠিক উলটো খেলা শুরু করলো। পরিবর্তন করলো অর্থনীতি, বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষানীতি। বন্ধুত্ব করলো ইজরায়েল এবং আমেরিকার সঙ্গে। আমাদের সংস্কৃতি এবং গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা পাশ্চাত্য দুনিয়াকে আমাদের আরও কাছে নিয়ে এল।১৯৯৫-এ

গ্যাট চুক্তি সম্পাদিত হলে সারা বিশ্বের পরিষেবা শিল্পের গন্তব্য হলো ভারত। মাইক্রোসফ্ট থেকে সিটি ব্যাংক সবাই ভারতের জ্ঞানচর্চার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে পাকিস্তান একটিই নীতি নিয়ে চলতে থাকে। সেটা হলো, সবাইকে বোকা বানানোর নীতি। প্রতিবেশী দেশ ভারত, প্রভু আমেরিকা, আইএমএফ, চীন, আফগাস্তিান, মুসলিম দুনিয়া থেকে নিজের দেশের সাধারণ মানুষ— সবাইকেই ঠকিয়ে যাওয়ার নীতি নিয়ে চলল তাদের সরকার। এরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে পাকিস্তানের প্রতি কম-বেশি নির্ভর করত। তাই একটা সময় পর্যন্ত সবাই পাকিস্তানকে সহ্য করেছে। ভারতের সঙ্গে মুখে মিষ্টি কথা বলে কাজে উগ্রপন্থী পাঠানো, আমেরিকার টাকা নিয়ে তাকে সাহায্য করার বদলে তাদের শত্রু ওসামা-বিন-লাদেনকে আশ্রয় দেওয়া, আইএমএফের থেকে টাকা ধার নিয়ে চীনকে শোধ দেওয়া, সৌদির টাকা নিয়ে আইএমএফকে শোধ। আর সবথেকে বেশি বেইমানি দেশের মানুষের সঙ্গে। তাদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো, শিল্প না বানিয়ে, ভরতুকি দিয়ে বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করে, তাদের মাথায় বিদেশি ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

তবে পাকিস্তানের আজকের অর্থনৈতিক ব্যর্থতার অন্যতম কারণ তাদের রাজনৈতিক অস্থিরতা। আজ পর্যন্ত তাদের কোনও নির্বাচিত সরকার পুরো টার্ম শেষ করতে পারেনি। এর ফলে প্রত্যেক শাসক দেশের উন্নতির চেয়ে নিজেকে বাঁচাতে বেশি ব্যস্ত থেকেছে। তাছাড়া বিদেশি বিনিয়োগ ওই দেশে আসেনি এই রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্যই। ধরা যাক আজ কোনও সরকার ঘোষণা করলো, তাদের কর্পোরেট ট্যাক্স ১০ শতাংশ। কাল নতুন সরকার এসে সেটা ৫০ শতাংশ করবে না তার কোনও গ্যারান্টি নেই। এমন অবস্থায় পাকিস্তানের মিলিটারি সরকার ওদের দেশকে সন্ত্রাসবাদীদের আউটসোর্সিং শিল্প হিসেবে কেন প্রতিষ্ঠা করলো এই ব্যাপারটা একটু ভালোভাবে বোঝা দরকার।

আমেরিকার মাইক্রোসফ্ট, গুগল্ বা উবর কোম্পানিগুলি যেমন তাদের শ্রমিক জোগান দেওয়ার জন্য ভারতীয় টিসিএস, ইনফোসিস বা উইপ্রোকে আউটসোর্স করতো, তেমনই মার্কিন সরকার বিভিন্ন যুদ্ধে মিলিটারি না পাঠিয়ে আফগানিস্তান, রাশিয়া এবং ভারতে উগ্রপন্থী পাঠানোর ব্যবস্থা করলো। এতে খরচ কম, ঝুঁকিও কম। নিজের মিলিটারি পাঠালে মিলিটারির থাকার জায়গা, সুরক্ষা, বিমা, পেনশন অফিস-সহ বিপুল খরচ বহন করতে হতো। সেখানে আমেরিকা দেখলো পাকিস্তানের মাটিতে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়ে হাতে কিছু অস্ত্র ধরিয়ে দিলে অনেক কম খরচেই খেলা শেষ। নব্বইয়ের দশকে ওদের 'টেক' কোম্পানিগুলি একদিকে তাদের কাজ টিসিএস, ইনফোসিসকে অফলোড করছিল, অন্যদিকে গেরিলা যুদ্ধের দায়িত্ব দিচ্ছিল মুজাহিদিন, তালিবান, আল-কায়দা, লস্করদের। একদিকে উদ্দেশ্য সাধন হলো, অন্যদিকে বদনামও হলো না। কিন্তু এসবের আড়ালে স্থায়ীভাবে পাকিস্তান ডুবতে থাকলো।

২০০১-এর পরে, আফগানিস্তানে আমেরিকা প্রবেশ করলে; তারা পাকিস্তানের বন্দর, বিমানবন্দর, রাস্তা-সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো ব্যবহার শুরু করলো। আমেরিকা এর জন্য পাকিস্তানকে বহু বিলিয়ন ডলার দিতে থাকলো। আমেরিকার আসকারায় পাকিস্তান আরও কিছু অন্যায় শুরু করলো। যেমন ভারতীয় টাকা জাল করে ছাপিয়ে ভারতে পাঠিয়ে উগ্রপন্থীদের সাহায্য এবং ভারতীয় সম্পদ চুরি। খুব সাম্প্রতিককালে মায়ারাম নামে এক ভারতীয় আধিকারিক গ্রেপ্তার হওয়ায় জানা যাচ্ছে, এই টাকা ছাপানোতে আমাদের এক প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীও জড়িত ছিলেন।

কিন্তু পাকিস্তান দেউলিয়া হলো কেন? এক, পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা সেদেশের বিনিয়োগের পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছে। দুই, প্রতিটি দেশকে কিছু আমদানি করতেই হয়। যেমন জ্বালানি তেল, ভোজ্য তেল, ওষুধ ইত্যাদি। তার জন্য প্রয়োজন বিদেশি মুদ্রা,যা সেই দেশ আয় করে পণ্য বা পরিষেবা রপ্তানি করে। কিন্তু পাকিস্তানে এমন কিছুই প্রায় নেই যা রপ্তানি করতে পারে। তিন, বিপুল ভরতুকি। যে কোনও অপদার্থ এবং একনায়কতান্ত্রিক শাসক দেশের মানুষকে খুশি করতে বিভিন্ন প্রকার ভরতুকি দেয়। পাকিস্তানও তার ব্যতিক্রম নয়। কম দামে জ্বালানি তেল, ভোজ্য তেল, চা সরবরাহ করে গেছে দেশের মানুষকে। সেই সময় আমাদের দেশের বিরোধী দলগুলি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের মুণ্ডপাত করেছে বেশি দামে পেট্রোল, ডিজেল বিক্রির জন্য। কিন্তু এই ভরতুকি একসময় দেশের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার নিঃশেষ করে দেয়।

প্রশ্ন ওঠে, তাহলে এতদিন পাকিস্তানের চলল কীভাবে? পাকিস্তানের নতুন করে সমস্যা কী হলো?

এক, পাকিস্তানকে ২৩ বার আইএমএফ বেল আউট অর্থাৎ ঋণ দিয়ে বাঁচিয়েছে। সমস্যা বহুদিনের। কিন্তু ভূরাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় আমেরিকা আইএমএফকে ঋণ দিয়ে যেতে বলে। দুই, চীনের থেকেও তাকা প্রচুর টাকা ঋণ নেয়। সেই দেনা শোধ করতে না পারলে দেশের সম্পদ চীনকে ৪০ বছরের জন্য লিজ দিয়ে দেয়। তিন, যুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্য আমেরিকার থেকে অর্থ সাহায্য পেত পাকিস্তান। টাকা এসে গেলে আবার সেটা পরিকল্পনাহীন খাতে খরচ করে ফেলত তারা। চার, ভারতীয় টাকা ছাপিয়ে তা দিয়েই ভারতীয় সম্পদ চুরি করত।

কিন্তু সবাই হাত সরিয়ে নিল কেন?

গতবছর আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে সরে গেলে তাদের পাকিস্তান নির্ভরতা কমে গেল। স্পষ্টভাবে বললে পাকিস্তানকে আমেরিকার আর প্রয়োজন রইল না। সঙ্গে সৌদি আরবও নিজেকে গুটিয়ে নেয়। আইএমএফ নতুন করে ঋণ দিতে অস্বীকার করে। এর মধ্যে ভারতে নোটবন্দি হলে জাল টাকা পাঠিয়ে ভারতে সন্ত্রাস ছড়ানোর খেলাও বন্ধ হয়ে যায়। চীন নতুন করে টাকা ধার না দিয়ে পুরনো ঋণের জন্য গোয়াদর বন্দর নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নেয়। ফলে পাকিস্তানের খেলা শেষ। তাই কাদায় পড়ে এখন তারা ভারতের প্রশংসা করছে। যদি কিছু সাহায্য পাওয়া যায়।

এইভাবে ৭৫ বছরে পাকিস্তান ধাপে ধাপে এক ব্যর্থ দেশে পরিণত হয়েছে। একনায়কতন্ত্র, সামরিক ক্ষমতার বাড়বাড়ন্ত, আর্থিক নিয়মানুবর্তিতার চূড়ান্ত অভাব, স্থায়ী সম্পদ তৈরিতে অনীহা এবং আইনশৃঙ্খলা/বিচারব্যবস্থার পতন আজ পাকিস্তানকে ব্যর্থতার দিকে নিয়ে গেছে। ফেরার পথ নেই।

(লেখক একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং চার্টার্ড ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট)

পাকিস্তানকে বিশ্বাস করে কূটনীতির ঐতিহাসিক ভুল আর নয়

সুশান্ত মজুমদার

ইমরান খানকে অপসারণ করে পাকিস্তান সেনা ও আইএসআই শাহবাজ শরিফকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করার পর থেকেই গত এক দশকের ধুঁকতে থাকা পাকিস্তানের অর্থনীতির কঙ্কালটা পুরো বিশ্ববাসীর কাছে বেরিয়ে এলো। গত কয়েক মাসে পাকিস্তানের এই অর্থনৈতিক অরাজকতা আরো চরম আকার নিয়েছে। আমরা দেখছি যে ডিসেম্বর, ২০২২ থেকেই পাকিস্তানের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া পুরোপুরি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে পাকিস্তানের বর্তমান আর্থিক অবস্থা নিয়ে। পাকিস্তানের তর্জন-গর্জনের রাজনীতি ও কূটনীতি এখন ভিখারীর কাতরতায় পর্যবসিত হয়েছে। আমেরিকা বিগত এক দশকে ধীরে ধীরে দক্ষিণ এশিয়ায় তার অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক আধিপত্য কায়েমে পাকিস্তান নির্ভরতা প্রায় অনেকটা কমিয়ে ফেলেছে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে যে বিফল সামরিক ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগ আমেরিকার পক্ষে সুখকর হয়নি, সেটা দেরিতে হলেও আমেরিকা বেশ বুঝেছে। কিন্তু চীন তার ভারত বিরোধিতার কূটনীতির দীর্ঘদিনের দোসর পাকিস্তানকে নিয়ে গত দেড় দশকে অনেক পরিকল্পনা করেও বিশেষ কোনো অগ্রগতি করতে পারেনি। ২০১৯ থেকে কোভিডের ফলে চীনের অর্থনীতির বেহাল দশা ও পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মাঝপথে ভেস্তে যাওয়ায় কমিউনিস্ট চীনও তার নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। এমতাবস্থায়, পাকিস্তানের বাকি সম্বল বলতে ইসলামী আরব দুনিয়া। বিশ্ব জ্বালানি তেল- অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক আরব দুনিয়া ও ধীরে ধীরে বুঝেছে যে কোভিড পরবর্তি এই পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গিয়ে জিও-পলিটিকাল সম্পর্কগুলো নিয়ে তাদেরও নতুন আঙ্গিকে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে যে, আরব দুনিয়া বেশ মূল্যায়ন করেছে যে শুধু ইসলামের দোহাই দেওয়ার নামে টেরোরিস্ট ফান্ডিং করা পাকিস্তানের মতন দেশ তাদের মাথার ওপর বোঝা হয়েই থাকবে আগামীদিনে। তাই আরব দুনিয়ার সাথেও পাকিস্তানের মাখামাখি প্রায় নেই। যে সৌদি আরব ছিল পাকিস্তানের সর্বোচ্চ অর্থ সাহায্যকারী, সেই দেশও তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। এই অবস্থায় বারবার আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের (আইএমএফ) কাছে ঋণ চেয়ে চেয়ে বিফল মনোরথে ফিরতে হচ্ছে শাহবাজ সরকারকে। ঋণের কঠিন শর্ত পালন করে মাথা মুড়িয়েও ঋণ বা সাহায্য কোনোটাই মিলছে না পাকিস্তানের। কারণ ১৯৪৭ এর স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তান যে খাতে সবচেয়ে বেশি তার দেশের অর্থ খরচ করেছে, সেটা হলো ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক খাতে যুদ্ধ করতে ও নাশকতায় এবং উগ্রপন্থী সংগঠনের বৃদ্ধি করতে। অর্থনীতিক উন্নয়ন বলতে আমরা যা বুঝি, তার কিছুটা হলেও পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে হয়েছে। বাকি পাকিস্তান এখনো অনুন্নয়ন ও দারিদ্রের মধ্যে ডুবে।

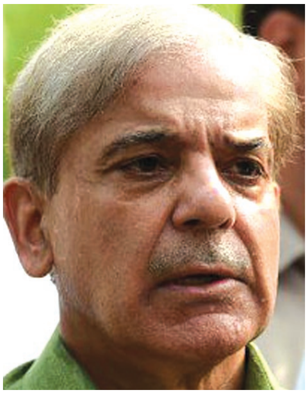

শাহবাজ শরিফ

ইমরান খান

১৯৪৭-এর ভারতভাগের পর থেকে ১৯৯৮ কার্গিল যুদ্ধ পর্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে তিন তিনটে যুদ্ধ করেছে পাকিস্তান। তাতে তার অর্থনীতির ঘা এখন ক্যান্সারে পরিণত

হয়েছে। কমিউনিস্ট চীনের পাল্লায় পড়ে শ্রীলঙ্কার মতন দেউলিয়ার পথে পাকিস্তান। চীনের covid নিয়ে নিজের দেশে এখন ''ত্রাহি মধুসূদন'', তাই সে তার সন্ত্রাসী পাকিস্তান ভাইয়ের থেকেও মুখ ঘুরিয়েছে। শাহবাজ সরকার ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সব দেশের কাছে ঘুরছে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে। কেউ এখন আর পাকিস্তানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

বিশ্বব্যাংক ঋণ দেওয়া বন্ধ করেছে। সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে হাহাকার। প্রায় অর্ধেকের বেশি মানুষ এখন অভুক্ত থাকছে। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে।

শিক্ষা ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দ তলানিতে ঠেকেছে। সরকারী কর্মী থেকে রেলকর্মীদের মাহিনা প্রায় বন্ধ। সরকারি গাড়ি ব্যবহারে লাগাম টেনে দেওয়া হয়েছে।

বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার প্রায় শূন্য। সারাদিনের অর্ধেক সময় লোডশেডিং। চাল-ডাল-আটা-ভোজ্য তেল-ওযুধের দাম সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। শিশুদের দুধের দাম অগ্নিমূল্য। রান্নার গ্যাস নেই। চা পান এখন সেই দেশে বিলাসিতা। তবে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের টাকা জোগান চলছে। তবে সেটাও আর বেশিদিন চালাতে পারবে বলে মনে হয় না। এদিকে গিলগিট-বালুচিস্তান সহ পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে শুরু হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। পাকিস্তানের বেশ কিছু অঞ্চলের মানুষ ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি চাইছে।

গত সাত দশকে ভারত বিরোধিতায় মত্ত ইসলামী দেশ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এখন সাহায্যের জন্যে ভিক্ষার ঝুলি এগিয়ে দিয়েছে ভারতের দিকে। সম্প্রতি শাহবাজ শরিফ এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তার এই কাতর আবেদন জানিয়েছে তার চিরশত্রু ভারতবর্ষের কাছে দ্বিপাক্ষিক সন্ধি আলোচনার জন্যে। স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ভারতের সাথে তিনটে যুদ্ধ করে পাকিস্তান শুধু নিজের ক্ষতিই করেছে। ইতিহাসের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! অন্য দেশের কাছে এইরূপ আলোচনার আবেদন জানানোর যে এক নির্দিষ্ট কূটনৈতিক প্রোটোকল রয়েছে, দেশের এই উদভ্রান্ত পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর এখন আর সেদিকেও খেয়াল নেই। তবে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় এই নিয়ে যাতে কোনো গাল-গল্প তৈরি না হয় বা দেশের অভ্যন্তরেও যাতে এই বিষয়ে কোনো বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে পড়ে, তাই তড়িঘড়ি ভারতের বিদেশমন্ত্রক তার বিবৃতি জারি করে জানিয়ে দিয়েছে যে ভারত এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো কূটনৈতিক আলোচনায় আগ্রহী নয়। পাকিস্তানকে নিয়ে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন ভারত। তাই ভারতের পাকিস্তানের প্রতি বিদেশনীতি কী হবে সেটা এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানকে কি সাহায্যের হাত বাড়াবেন প্রধানমন্ত্রী?

পাকিস্তানকে ''দয়া'' দেখাতে গিয়ে ইতিহাসের ভুলের পুনরাবৃত্তি করবেন না তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী? মনে রাখা উচিত যে ঐতিহাসিক এই মানবতা দেখানোর কূটনৈতিক ভুল ভারত বারবার করেছে। এবং ভারত আজ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই ভুলের মাশুল গুনছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী কি জওহরলাল নেহেরুর বা ইন্দিরা গান্ধীর করা সেই ''ভুলের'' (পড়ুন কূটনৈতিক অদূরদর্শিতা) পুনরাবৃত্তি করবেন? না কি মহান সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহানের ''মহানুভবতা'' দেখানোর হাজার বছরের মারাত্মক ভুলের পুনরাবৃত্তি করে বসবেন?

স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের আর্থিক সংকটের সময় তাদের পাশে দাঁড়াতে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মন্ত্রিসভার প্রায় বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁর পাকিস্তান প্রীতি দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু জিন্নাকে কয়েকশো কোটি টাকার সাহায্য পাঠিয়ে তৎকালীন জিন্না সরকারকে বাঁচিয়ে ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সেই উপকার ভুলে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধেই সন্ত্রাসবাদে উস্কানি দিয়েছে আবার সেই সঙ্গে কাশ্মীরসহ পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও উগ্রপন্থাকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে। তিন তিনটে যুদ্ধ করেছে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে। বিগত সাত দশকে পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখদের ওপর হত্যা, ধর্ষণ ও অত্যাচার চলেছে। নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি করেও পাকিস্তান সেখানকার সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু ও শিখদের হত্যা করাতে মদত জুগিয়েছে। কোটি কোটি হিন্দু ও শিখ প্রাণ ও সম্ভ্রম বাঁচাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। ভারতের সংকটে এই অকৃতজ্ঞ ও সন্ত্রাসী দেশ গত ৭৫ বছর ধরে সুযোগ খুঁজে খুঁজে ভারতবিরোধী সন্ত্রাসী ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ করে চলেছে। হিন্দুস্থানের বিরোধিতাই অন্যতম রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে পাকিস্তানে।

ভারত বিরোধিতা ও ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তাদের সরকারি নীতির মূলমন্ত্র। তাই শাহবাজ শরিফের একটা টেলিভিশন সাক্ষাৎকার এই দীর্ঘদিনের ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্রের ঘুটি নাড়াতে পারবে না। ভাবুন আর একবার ১৯৯৮-এর কার্গিল যুদ্ধ। ভারতের অর্থনীতির তৎকালীন টালমাটাল অবস্থায় আমেরিকার থেকে ভিক্ষা নিয়ে এই পাকিস্তান ভারতের ওপর সুযোগ বুঝে আক্রমণ করেছে। এরপর পাকিস্তানের মদতে ২০০১-এর সংসদ হামলা, ২০০৮-এর মুম্বাই হামলা থেকে কাশ্মীরে সাত দশকের নাশকতা ভারতকে অস্থির করেছে বারবার। ভারতের অর্থনীতিতে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় না উল্লেখ করে পারছি না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও আবার সেই একই কূটনৈতিক ভুল করেছিলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে (বর্তমান বাংলাদেশ) স্বাহায্য করে। ভারতের দয়ায় স্বাধীন হওয়া ও তাদের দেশগঠনে হাজার হাজার কোটি আর্থিক সাহায্য নেওয়া অকৃতজ্ঞ বাংলাদেশের আজকের অবস্থা লক্ষ্য করুন। সেখানে ভারত বিরোধিতা রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সারা পৃথিবীতে এই দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাবেন না। ভারত স্বাধীন হাবার সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে পশ্চিমবঙ্গ আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন, ১৯৭১-এর বাংলাদেশ যুদ্ধের পর প্রতিদানস্বরূপ ইন্দিরা গান্ধী দিনাজপুরের ''চিকেন নেক'' ও ''তিনবিঘা করিডোর'' সংক্রান্ত সীমান্ত সমস্যা সমাধান করার উদ্যোগ যদি নিতেন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে পদ্মার জলচুক্তির সমাধান চাইতেন, তাহলে একটা দেশকে স্বাধীন করার প্রতিদানে কি খুব বেশি কিছু চাওয়া হতো? ভারতের পরিবর্তে চীন যদি এই যুদ্ধ করত, তাহলে বাংলাদেশ আজ তিব্বতের মতন চীনের অধীন একটি উপনিবেশ হিসেবে মর্যাদা পেত। কিন্তু আমরা দেখছি, ভারতের সাহায্যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই গত ৫ দশকে সেই বাংলাদেশে শুরু হয়েছে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, খুন, ধর্ষণ ও দেশ থেকে উচ্ছেদ। কয়েক কোটি বাংলাদেশী হিন্দু আজ ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে বসবাস করছেন। উল্টে সেই অকৃতজ্ঞ বাংলাদেশ এখন ভারত বিরোধিতায় মত্ত এক ইসলামী দেশ।

তাই, পরিশেষে বলা যায় যে ইতিহাসের ভুলের থেকে যদি শিক্ষা না নিতে পারি, তাহলে তার মাশুল গোনার অপেক্ষায় থাকতে হবে আগামীদিনে। পাকিস্তান যে সংস্কৃতির ধারক-বাহক, সেখানে ''শান্তিপূর্ণ'' প্রতিবেশীর ছদ্মবেশকে সাদা চোখে বিশ্বাস করলে সম্রাট পৃথ্বীরাজের ভুলের পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু হবে বলে মনে করি না। বাকিটা ভবিষ্যতের হিসেবের খাতায় রাখা থাকুক। ■

পাকিস্তান

একটি ব্যর্থ দেশ ও তার স্তাবক অনুচরদের কিস্‌সা

কৌশিক কর্মকার

আজ থেকে নয় দশক আগে, ১৯৩৩ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলি প্রকাশ করেছিলেন একটি প্যামফ্লেট, যার শিরোনাম ছিল, 'Now or Never; Are We to Live or Perish Forever'। এটিই পরবর্তীকালে 'Pakistan Declaration' নামে পরিচিতি লাভ করে ও অচিরেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইনিই ছিলেন 'পাকিস্তান' ধারণার স্রষ্টা; পাকিস্তান ডিক্লেয়ারেশনের সারমর্ম ছিল অবিভক্ত ভারতে মুসলমানেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তাই কেবল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র দেশের প্রয়োজন। আদ্যন্ত একটি ধর্মীয় দেশ রূপে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল; ধর্মকে একমাত্র পরিচিতি হিসেবে মান্য করে পাকিস্তান স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর যে দুটি কাজ সফলভাবে করতে সমর্থ হয়েছে তা হলো হিন্দু, খ্রিস্টান-সহ সকল প্রকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করা এবং ভারত ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ-সহ সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদ রপ্তানিতে শীর্ষস্থান অধিকার করা।

গত দু-এক সপ্তাহ যাবৎ পাকিস্তান দেশটি আবার আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। সংবাদমাধ্যম-সহ সারা পৃথিবীর সামাজিক মাধ্যমে বেশ কিছু ভিডিয়ো ক্লিপিংস ঘোরাফেরা করছে। যার একটিতে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত একটি শহর মিরপুর খাসে কয়েকশো মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন কেবল পাঁচ কেজি আটার ভরতুকিযুক্ত একটি প্যাকেট নেওয়ার জন্য। কারণ খোলা বাজারে আটার দাম আকাশ ছুঁয়েছে— যা একান্তভাবেই সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। সেখানে হঠাৎ করে রেশনের ট্রাক আসে। লাইন ভেঙে বুভুক্ষু মানুষ সামনে এগিয়ে যায়, ফলস্বরূপ দেখা দেয় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। মৃত্যু ঘটে নাগরিকের, অসংখ্য মানুষ আহত হন। আরেকটি ক্লিপিংস টুইটারে শেয়ার করেছেন প্রফেসর সাজ্জাদ রাজা, যিনি 'ন্যাশনাল ইকুয়ালিটি পার্টি জেকেজিবিএল-এর চেয়ারম্যান। যেখানে দেখা যাচ্ছে ভর্তি একটি ছোটো ট্রাকের পিছনে অসংখ্য মানুষ বাইকে করে আসছে শুধু এক প্যাকেট আটা পাওয়ার আশায়। ওই ভিডিয়োর প্রেক্ষিতে অধ্যাপকের টুইটটি উদ্ধৃতিযোগ্য : 'This isn't a motorcycle rally, ppl in Pakistan are desperately chasing a truck carrying wheat flour, hoping to buy just one bag. Ppl of #JammuAndKashmir should open their eyes. Lucky not to be Pakistani & still free to take decision about our future. Do we have any future with Pakistan?'

অপর একটি ক্লিপিংসে করাচির গৃহবধূ রাবিয়া দেশের নেতাদের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন, তিনি তাঁর সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আটা, ঘি, চিনি, ডালের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য চূড়ান্তভাবে খোলা বাজারে দুর্লভ হয়ে পড়েছে। উপরোক্ত প্রত্যেকটি ঘটনার সারসত্য যা তা হলো পাকিস্তানে ভয়াবহ খাদ্য সংকট চলছে। সেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় আটা, পেঁয়াজ ও সর্ষের তেলের দাম যথাক্রমে ১৬০ টাকা, ২২০ টাকা ও ৩২৫ টাকা প্রতি কেজি। দেশের কোণায় কোণায় বিক্ষোভ চলছে। বালুচিস্তানের পর সিন্ধু প্রদেশও পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি চাইছে।

কেবল খাদ্য সংকট নয়, অর্থনৈতিকভাবেও পাকিস্তান বর্তমানে পুরোপুরি বিধ্বস্ত। বর্তমানে পাকিস্তানের বৈদেশিক সঞ্চয়ের পরিমাণ

ফ : ৪

৪.৩ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে যা দিয়ে খুব বেশি হলে তিন সপ্তাহ আমদানি প্রক্রিয়া কার্যকর করা সম্ভব। অল পাকিস্তান কাস্টমস এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য রেহমান মালিক জানাচ্ছেন, করাচি বন্দরে হাজার হাজার জীবনদায়ী ওষুধ, কাঁচামাল, মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ভর্তি কন্টেনার আটকে আছে। এরকম অবস্থায় দেশে ডলারের জোগান অব্যাহত রাখতে পাকিস্তান কার্যত ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বন্ধু দেশগুলিতে দরবার করে চলেছে। এই উদ্দেশ্যেই গত ১২ জানুয়ারি পাক প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে যাওয়া; যেখানে সংবাদমাধ্যমের সামনে রাখা তাঁর বক্তব্যগুলি অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকটা 'এ কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে'র আদলে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ জানাচ্ছেন তাঁর দেশের ভারত-বিরোধী নীতিই আজ তাঁদের পথের ভিখিরি করে ছেড়েছে। তাঁর বক্তব্য, ভারতের সঙ্গে তিনটি যুদ্ধের ফলে তাঁরা আরও বেশি গরিব, আরও বেশি কাঙাল হয়েছে। বেকারত্ব গোটা দেশকে গ্রাস করেছে নির্মমভাবে।

তাই তারা এখন ভারতের সঙ্গে শান্তি চায়, কথোপকথন চায়, অস্ত্র গোলাবারুদ কিনতে চায় না, খাদ্যদ্রব্য কিনতে চায়। তবে ঘরে বাইরে নিদারুণ চাপের সামনে পাক প্রধানমন্ত্রীর এরূপ বক্তব্য অবশ্যম্ভাবী হলেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ পাকিস্তানের অতীতের ট্র্যাক রেকর্ড বলছে সে তার ভারতবিরোধী জঙ্গি কার্যকলাপ কখনোই ত্যাগ করবে না। স্টেট স্পনসর্ড টেরোরিজমের যে জ্বলন্ত প্রমাণ পাকিস্তান সারা বিশ্বের সামনে রেখেছে, পাক রাষ্ট্র চাইলেও এখন সেই অন্ধকূপ থেকে বের হতে পারবে না। নিজেদের তৈরি করা সন্ত্রাসবাদীরাই আজ ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো পাকিস্তানকে গিলে খেতে চাইছে। টিটিপির মতো সংগঠন দেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত খাইবার পাখতুনখোওয়া প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপে কবজা করতে চায়, যেখানে পাক সরকারের বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ তারা বরদাস্ত করবে না। ২০২১ সালে প্রতিবেশী আফগানিস্তান তালিবান শাসনে আসার পর পাকিস্তান উল্লসিত হয়েছিল এই ভেবে যে তালিবান কাশ্মীর দখলে সহায়তা করবে! আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। ২ জানুয়ারি ২০২৩ তালিবান নেতা ও আফগান ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার আহমদ ইয়াসির একাত্তরের যুদ্ধে পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয়ের ছবি শেয়ার করে বলেছেন, টিটিপি'র উপর সামরিক আক্রমণ হলে পাকিস্তানের পূর্ব পরিণতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি দেউলিয়া পাকিস্তানকে আর ঋণ দিতে রাজি নয়। বর্তমানে পাকিস্তানের একমাত্র সহায় বন্ধু চীন, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য পাকিস্তানকে ঋণের ফাঁদে ফেলে একটি পুরোদস্তুর উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করা। দিশেহারা পাক সরকার নাগরিকদের উদ্দেশ্যে নিদান দিচ্ছে বিদ্যুৎ বাঁচাতে তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করতে হবে, বিয়ে বাড়ির ব্যয় সংকোচ করতে হবে ইত্যাদি। তবে পেটে ভাত না থাকলে কী হবে, পাকিস্তান তার ধর্মীয় জিগির থেকে কখনো বিচ্যুত হতে চায় না। গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ পাক সংসদ তাদের কুখ্যাত ব্লাসফামি আইনকে সংশোধন করে শাস্তির পরিমাণকে তিন থেকে দশ বছরে বাড়িয়ে তুলেছে। বলাবাহুল্য যা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আরও প্রান্তিক, আরও বিপদগ্রস্ত করে তোলার সরকারি হাতিয়ার হিসেবে অচিরেই প্রযুক্ত হবে।

তবে এই 'পাকিস্তান'ও হয়ে উঠতে পারে এদেশের কারোর আদর্শ! জানিয়ারি মাসের ৬ থেকে ৯ তারিখ ভারতের বৃহত্তম বাম দলের মহিলা শাখার জাতীয় সম্মেলন হয়ে গেল কেরলের তিরুবনন্তপুরমে। এই সম্মেলনের জন্য নির্মিত পোস্টারের মুখ ছিলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো! তাঁর পরিচয় হিসেবে পোস্টারে লেখা ছিল, 'Benazir Bhutto the first woman prime minister of Pakistan was also presented with the honorary doctorate by 9 universities including Harvard University.' অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে এ হেন গুণসম্পন্ন কোনো ভারতীয় নারীর সন্ধান আয়োজকরা খুঁজে পাননি। তো কে এই বেনজির ভুট্টো? তাঁর যে পরিচয় পোস্টারে স্থান পায়নি, তা খানিকটা খুঁজে দেখা যেতে পারে।

পূর্বতন পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার ভুট্টোর কন্যা বেনজির ভুট্টো। এই জুলফিকার ভুট্টো ১৯৬৫ সালে জাতিসঙ্ঘে নিরাপত্তা পরিষদের বক্তৃতায় ভারতের বিরুদ্ধে এক হাজার বছরের যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ভারতের শরীরকে হাজারটি ক্ষতের মাধ্যমে রক্তাক্ত করতে চেয়েছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ১৯৪৩ সালের ২৬ এপ্রিল তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ি সিন্ধু প্রদেশের লাকড়ানা থেকে জিন্নাহকে চিঠি লিখে জানাচ্ছেন : 'Musalmans should realise that Hindu can never and will never unite with us, they are the deadliest enemies of your Quran and prophet'। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বেনজির ভুট্টো; ১৯৯০ সালে যিনি কাশ্মীরে কাশ্মীরি মুসলমানদের 'আজাদী'র উদ্দেশ্যে চূড়ান্তভাবে প্ররোচিত করেন : 'That Jagmohan (Governor of Jammu and Kashmir in 1990) will be cut into Jag-Jag-Mo-Mo-Han-Han. Kashmiri Muslims do not fear because they are Muslims. Kashmiri Muslims have the blood of Mujahids and Ghazis in their veins. Kashmiries will take their freedom with bravery. From every town, village and every mosque only one voice will echo, Azaadi'। যার অনিবার্য ফলাফল হিসেবে উপত্যকা থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিতাড়ন পর্ব শুরু হয়। অসংখ্য কাশ্মীরি পণ্ডিতকে নিজভূমে পরবাসী করার প্রকল্পের অন্যতম অনুঘটক ছিলেন এই বেনজির ভুট্টো। সেই বেনজির আজ পোস্টারের মুখ! এটি অবশ্য নতুন কিছু নয়। যারা জন্মলগ্ন থেকে ভারত রাষ্ট্রের খণ্ড খণ্ড বিভাজনে বিশ্বাসী, যাদের কাছে ভারত রাষ্ট্র আলাদা আলাদা আঠারোটি জাতিগোষ্ঠীর সমষ্টি, তাদের সভার মুখ যে পাক প্রধান হবেন সেটাই একান্তভাবে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। সেই কারণেই একটা প্রশ্ন ওয়াকিবহাল মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে। পাকিস্তান দুর্বল হলে কি সন্ত্রাসবাদও দুর্বল হবে? প্রতিবেশী পাকিস্তানের ভবিষ্যত নিয়ে ভারতের মাথাব্যথা এই প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ▮

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি। ভারতের অমর স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে 'নেতাজী লহ প্রণাম' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের প্রায় ৫ হাজার স্বয়ংসেবকের উপস্থিতিতে ভাষণ দেন।

তিনি বলেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু গৌরবময় ভারত গড়ার জন্য বহু ত্যাগ ও তপস্যা করেছেন। জীবনের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে বনবাসের মতো জীবন কাটিয়েছেন। বহুবার কারাবরণ করেছেন। সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত জীবনের আদর্শ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে প্রতি বছর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্মরণে ছোটো-বড়ো নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়---কখনও কলকাতার শ্যামবাজার, কখনও অসমের শিলচরে, কখনও সঙ্ঘের

গৌরবময় ভারত গড়ার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন একটি আদর্শ উদাহরণ : মোহনরাও ভাগবত

শাখায় শাখায়, আবার কখনও সমাজে মানুষের মাঝে।

তিনি বলেন যে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—একজন নেতা এমন হওয়া উচিত যিনি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত, নিঃস্বার্থ এবং যিনি জাতির চেতনা জাগরণের কাজ করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন তার যথাযথ দৃষ্টান্ত। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হওয়ার পরে এবং বিপদের মধ্যে যখন সৈন্যদের পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছিল, তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও তাদের সঙ্গেই হাঁটতেন। সৈন্যরা যে খাবার খেতেন নেতাজী সেই একই খাবার খেতেন এবং সবার সঙ্গেই থাকতেন। তিনি যে সময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, সে সময়ে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের সূর্য মধ্যগগনে। সেই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আবেদন নিয়ে তৎকালীন সময়ে তিনি মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছেছিলেন। ভাগ্যচক্র সঠিকভাবে চললে ভারতের ভিতরে পৌঁছে গিয়ে এদেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে অনেক আগেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা এনে দিতে পারতেন নেতাজী।

শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন--- ''স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, গুরু গোবিন্দ সিংহ যেভাবে সমাজের জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর চার পুত্রের বলিদান হবার পরেও, তিনি স্বধর্ম রক্ষায় লড়াই করা বন্ধ করেননি। যাদের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন, তাদেরই উপহাস সহ্য করেও গুরু গোবিন্দ সিংহ সংগ্রাম থেকে পিছপা হননি। নেতাজীকেও একই ভাবে নিজের সমাজের বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছিল।

শ্রী ভাগবত বলেন আজ এদেশেও নিবেদিতপ্রাণ যুবকদের প্রয়োজন, যারা একটি গৌরবময় জাতি গঠন করতে পারে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তার জীবন্ত উদাহরণ।

স্বাধীনতা থেকে স্বতন্ত্রতার দিকে যাত্রার কথা উল্লেখ করে শ্রী ভাগবত বলেন যে, ''আমরা ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন হয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমরা আমাদের ঐতিহাসিকতা এবং আমাদের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে স্বতন্ত্রতার দিকে আজও এগিয়ে যেতে পারিনি। এটাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্বপ্ন ছিল।'' তিনি আরও বলেন, ''আমরা যখন গৌরবময় ভারত গড়ার কথা বলি, তার মানে এই নয় যে, কেবলমাত্র ধন সম্পদেই দেশকে সমৃদ্ধ হতে হবে। আমেরিকা ও চীনও নিজেদের সমৃদ্ধ দেশ বলে। আমাদের এমন একটি গৌরবময় ভারত গড়তে হবে যা সারা বিশ্বে সুখ ও শান্তি আনতে পারে। ভারত সারা বিশ্বকে ধর্মের দিশা দেয়। মানুষের অগ্রগতির পাশাপাশি আমরা সমগ্র বিশ্বের কথা ভাবি। এটাই আমাদের অগ্রগতির সংস্কৃতি। সেজন্য আমাদের এমন একটি গৌরবময় ভারত গড়তে হবে যার দিকে সারা বিশ্ব আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে।''

নেতাজী সারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন দেশের জন্য। তাঁর প্রতিটি কাজ ছিল রাষ্ট্রের জন্য উৎসর্গের ভাবনায় জারিত। আমাদের যথার্থ মানুষ নির্মানের মাধ্যমে একটি গৌরবময় ভারত গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করে সরসঙ্ঘচালক বলেন ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে (কলকাতা) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর 'ভবিষ্যৎ ভারত' নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, ''ভারত পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র রূপ। সারা বিশ্বে যে ধরনের সমস্যা আছে, সব ধরনের সমস্যা ভারতে বর্তমান। অতএব, ভারতের সমস্যার সমাধান করা মানেই সমগ্র বিশ্বের সমস্যার সমাধান।'' নেতাজী বারবার বলতেন যে, রাষ্ট্রীয়তার বিকাশ ছাড়া ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোনো অর্থ নেই। রাষ্ট্রীয়তা ছাড়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ অসম্পূর্ণ। সমাজের কোনো একটা ছোটো অংশের বিকাশ করলেই হবে না, সম্পূর্ণ সমাজের বিকাশ চাই। রাষ্ট্রীয়তার চর্চা ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পরাধীনতার শুরু।

এদেশে অনেক ভাষা, অনেক পন্থ রয়েছে কিন্তু তার মধ্যেই ঐক্য আছে। সব বিষয় বজায় রেখে, তার মধ্যে রাষ্ট্রীয়তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সঙ্ঘের প্রার্থনাতে প্রথমে রাষ্ট্র তারপর ভগবানের নাম নেওয়া হয়, একেবারে শেষে ভারতমাতার জয় বলা হয়।

সঙ্ঘের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য সংগঠনগুলির মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের বার্তা দিয়ে সরসঙ্ঘচালক বলেন, ''দেশে যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছিল, তখন অনেক মতাদর্শের মানুষ ছিল। সবার পথ আলাদা, কিন্তু গন্তব্য ছিল একই দেশের স্বাধীনতা। আমরা তা অর্জন করেছি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যে গৌরবময় ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন পূরণে সঙ্ঘ এগিয়ে চলেছে।''

নেতাজী চরিত্রবান দেশভক্ত ব্যক্তি নির্মাণ করে সমাজের ক্ষমতায়ন চেয়েছিলেন। সঙ্ঘও যথাযথ মানুষ তৈরি করে একই উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে চায়।

আমরা কোনো নির্বাচনে জিততে চাই না। আমাদের লক্ষ্য একটাই— আমাদের এই দু'চার দিনের জীবন থাক বা না থাক, মাগো, তোমার মহিমা অমর হয়ে থাকুক। দেশের প্রয়োজনে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা হাসতে হাসতে আত্মাহুতি দিয়েছেন। আজ আমরা স্বাধীন। আমাদের ত্যাগী হতে হবে, দেশের জন্য এখন আর মরতে হবে না বরং দেশের ভবিষ্যতের জন্য প্রতি মুহূর্তে বাঁচতে হবে। সঙ্ঘ দেশের জন্য বাঁচার সমর্পণের ভাব নিয়ে কাজ করে চলেছে।

যাদের ত্যাগ ও তপস্যায় ভারত উন্নতিসাধন করছে, তাদের কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু ঐতিহাসিক চিন্তাধারা অনুযায়ী স্বাধীন ভারতের একটি নতুন রূপ তৈরি করতে হবে। সেই কারণেই প্রতি বছর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্বয়ংসেবকরা স্মরণ করেন এবং তাঁর স্বপ্নের ভারত গড়তে মানব-নির্মাণের কাজ করছেন। নেতাজী সারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন দেশের জন্য। তাঁর প্রতিটি কাজ ছিল রাষ্ট্রের জন্য উৎসর্গের ভাবনায় জারিত। আমাদের যথার্থ মানুষ নির্মাণের মাধ্যমে একটি গৌরবময় ভারত গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। ■

শ্রী, লক্ষ্মী, ধান্যলক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী এবং বাণিজ্য লক্ষ্মী

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এবং অরিত্র ঘোষ দস্তিদার

'শ্রী' এবং 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' কথাটি তো আমরা জানি। কিন্তু 'শ্রী' শব্দের অর্থ কী? আচার্য মহীধরের মতে যাঁর দ্বারা সর্বজনের আশ্রয় হয়, তিনি শ্রী। যাঁর দ্বারা আশ্রিত হই আমরা, তিনিই শ্রী। যাঁকে শ্রী বলা হবে তাঁর ভরতুকি বা আশ্রয়ের প্রয়োজন হবে না, তিনি অন্যকে স্বনির্ভরতার আশ্রয় দেবেন, আশ্রিতের দুর্গতি দূর করবেন। 'শ্রী' মানে সম্পদ; 'শ্রী' মানে শোভা; 'শ্রী' মানে জ্যোতি। দেবী লক্ষ্মীর অসংখ্য নাম রয়েছে, তার মধ্যে সবচাইতে প্রাচীন নাম হলো 'শ্রী'। ঋগ্বেদে 'শ্রী' শব্দের ব্যবহার আছে। একবার ছাড়া (সেখানে অর্থ 'সমৃদ্ধি') 'পার্থিব সম্পদ' অর্থে 'শ্রী' শব্দটি কখনোই ব্যবহার হয়নি, 'সৌভাগ্যদেবী' অর্থেও ব্যবহৃত হয়নি। 'শ্রী' শব্দটি ব্যবহৃত হতো সৌন্দর্যময় বা শোভাময় বোঝাতে। আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বলতে বুঝি ধানের গোলা, গৃহে সংরক্ষিত খাদ্যোপাদান এবং সাত্ত্বিক উপায়ে উপার্জিত ধনরত্ন যা ধানের আবাদে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে সংগৃহীত হয়, যার আহরণের মধ্যে একটা কর্মোদ্যোগ ও সম্মান জড়িত থাকে।

বেদ ও পুরাণ অনুসন্ধান করে মনে হয়, 'শ্রী' আর 'লক্ষ্মী' এক দেবী ছিলেন না। আলাদা আলাদা দুই দেবী কালের প্রয়োজনে মিশে গেছেন। শ্রী আর লক্ষ্মীদেবী মিলে আবির্ভূত হয়েছেন আজকের লক্ষ্মী। 'লক্ষ্মী' শব্দের অর্থ কী? যার দ্বারা লক্ষিত হয়, তিনিই লক্ষ্মী। জানা যায়, শ্রী ও লক্ষ্মী অভিন্ন দেবী ছিলেন না। দুই পৃথক দেবতা ক্রমে মিলিত হয়ে দেবী লক্ষ্মীতে পরিণত হয়েছে। লক্ষ্মীকে তাই বলা যেতে পারে অভিসৃত দেবী বা Convergent Goddess। শ্রী ও লক্ষ্মী এই দুই সমান্তরাল বা Parallel Goddess মিলে লক্ষ্মী। যেমন বিষ্ণুর দশাবতার হচ্ছেন তাঁর Divergent বা ভিন্ন রূপ।

সামাজিক ভাবে কিংবা কৃষি পরিমণ্ডলে 'লক্ষ্মী' কাকে বলি? একটি প্রচলিত কথা হলো, 'জলে ভিজ্যা, রোদে পুইড়্যা আনছি ঘরে লক্ষ্মী।' তার মানে কৃষি উৎপাদন মানেই লক্ষ্মী লাভ। গ্রামবাঙ্গলায় 'ক্ষেত্র-লক্ষ্মী' বা 'ধান্যলক্ষ্মী'র নাম পাওয়া যায়। প্রবাদে আছে, 'ধান ধন বড়ো ধন/আর ধন গাই/সোনারুপা কিছু কিছু/আর সব ছাই।' বলা হয় 'ধানের আবাদে ধন'। বাঙ্গলার কোনো কোনো জায়গায় লক্ষ্মীপুজো কোনো মূর্তি কিংবা পট রেখে হয় না। হয় একটি কুনকের মধ্যে নতুন ধান রেখে, তা লাল শালুতে মুড়ে, কুনকে-তে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা বা কড়ি রেখে। কোথাও কুনকের ধানের উপর কাঠের বা পিতলের পেঁচামূর্তি রেখে। এ থেকে বোঝা যায়, ধানই লক্ষ্মী। যেহেতু ধানের ক্ষেতে 'অলক্ষ্মী' পদবাচ্য ইঁদুর মারাত্মক একটি আপদ, তাই ইঁদুর ভক্ষণকারী পেঁচা (শত্রুর শত্রু) সেখানে লক্ষ্মীর প্রতিনিধি। পেঁচা লক্ষ্মীর বাহন হয়েছে এক ধন্যবাদাত্মক চিন্তনের মধ্যে দিয়ে। কোথাও 'প্যাঁচাই লক্ষ্মী'র কাঠের মূর্তি ধানের সঙ্গে পূজিতা হন। বাঙ্গলার অনেক স্থানেই কৃষিজমির আগাছাকে 'অলক্ষ্মী' বলা হয়। কারণ আগাছা কৃষিতে অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ। তারা মূল ফসলের থেকে সার-জল কেড়ে নেয়,

জায়গা দখল করে। মূল ফসলকে ছাপিয়ে তার বিটপ, পত্র-পল্লব সূর্যালোক ভোগ করে, মূল ফসলকে আড়াল করে। কৃষক তাই 'নিড়িয়ে অলক্ষ্মী' দূর করেন। তা না হলে অলক্ষ্মীর দাপটে 'লক্ষ্মীর দান' বা ধান গোলায় আসবে না। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, 'One year seeding is seven year's weeding.' একবার যদি কোনো আগাছা কৃষিজমিতে ফুল হয়ে ফল ও বীজের পরিপক্বতায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়, তবে জমি থেকে সেই আগাছা দূর করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অনেকদিন ধরে জমিতে তার বীজ অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা ধরে রাখে, বারবার তা থেকে আগাছার চারা বের হয় এবং মূল ফসলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এজন্যই বলা হয়, এক বছরের জন্য আগাছা বীজ ঢাললে, সাত বছর নিড়িয়ে তুলতে হয়, তবে সেই আগাছা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অতএব কৃষিজীবী মানুষের কাছে কেবল ইঁদুর নয়, আগাছাও অলক্ষ্মী। এর বিপ্রতীপে কেবল ধানই যে লক্ষ্মী তা নয়, শাকসবজি- ফলমূলও লক্ষ্মী বলে মনে করেন বাঙ্গলার কৃষক। খনার একটি বচন আছে, 'চাল ভরা কুমড়ো লতা/ লক্ষ্মী বলেন, আমি তথা।' এই বচন প্রমাণ করে খনার সময়ে গ্রামবাঙ্গলা নানান উদ্যান ফসলে সমৃদ্ধ ছিল এবং তার চাষ লক্ষ্মীলাভ রূপে গণ্য ছিল। ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে সমসাময়িক সময়ে উদ্যান ফসল চাষের এত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না, যা খনার বচনে দেখতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলায় দেবী দুর্গার আরাধনায় 'শাকম্ভরী' দুর্গাকেও স্মরণ-মনন করা হয়। শাকম্ভরী দুর্গা হচ্ছেন দেবীর উদ্যান ফসল হয়ে ওঠার কাহিনি এবং মানুষকে পরিপুষ্টি দিয়ে তার দুর্গতি দূর করা। জীবনে খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদনই সবচাইতে বড়ো লড়াই, বড়ো লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেবী লক্ষ্মীই ভরসা। কৃষি সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছে দেন দেবী। মানুষের মরাই বা গোলা ভরা থাকলে তার অশেষ দুর্গতি দূর হয়। দেবীর 'অন্নপূর্ণা' রূপ এবং 'শাকম্ভরী' রূপের পাশাপাশি তাঁর ধান্যরূপ পাওয়া যায় দেবী মহালক্ষ্মীর মধ্যে।

ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ। তার উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন সে সামুদ্রিক জলযানে ভরে বিশ্বের নানান জায়গায় প্রেরণ করেছে। বিনিময়ে সংগ্রহ করেছে বিশ্বের অপরাপর অমূল্য সম্পদ। তাই বলা হয় 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'। 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস।' ময়ূরপঙ্খী নৌকায় ভারতীয় পণ্য সমুদ্র পেরিয়ে ধন আহরণ করেছে বলেই ধান্য-লক্ষ্মী হয়ে উঠলেন 'ধনলক্ষ্মী'। কৃষি ও কৃষিভিত্তিক বাণিজ্য করেই হয়েছে ধনাগম। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর 'নবান্ন' কবিতায় লিখছেন, 'লেপিয়া আঙিনা দ্যায়/আলপনা ভরা মরাইয়ের পাশে,/ লক্ষ্মী বোধহয় বাণিজ্য ত্যাজি'/এবার নিবসে চাষে।' লক্ষ্মী বণিকদেরও দেবী, তিনি কৃষকেরও দেবী, তিনি ব্যবসায়ীদেরও দেবী। বাঙ্গলার কোনো কোনো স্থানে দেবীকে পুজো করা হয় নৌকাবাহনা রূপে। কলাগাছের খোল বা মান্দাস থেকে তৈরি করা হয় নৌকা, তার মধ্যে নানান কৃষিপণ্য, অলংকার, মূল্যবান ছোটো ছোটো সামগ্রী, নৈবেদ্য থরে থরে সাজিয়ে দেবীকে আরাধনা করা হয়, যার মধ্যে ফুটে ওঠে বাঙ্গলার কৃষি সমৃদ্ধির চিরকালীন পরিচয়। ব্যবসায় প্রচণ্ড আর্থিক ঝুঁকি নিতে হয়, সজাগ থাকতে হয়। সেই থেকেই ব্যবসায়ীদের নিশি জাগরণ এবং অক্ষক্রীড়ার রীতি কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণা করা দরকার। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার মধ্যে জাগরণ বা সচেতন মনের প্রসঙ্গ হয়তো লুকিয়ে আছে। দীপান্বিতা লক্ষ্মী আরাধনার মধ্যে হয়তো লুকিয়ে আছে ব্যবসায়িক অন্ধকার ছাপিয়ে আলোর দিকে যাবার সদর্থক উপাসনা। এই দুইয়ের মধ্যেই ধনলক্ষ্মীর আরাধনা সুস্পষ্ট।

এখন এই লক্ষ্মী আরাধনা কি কেবলই বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমায়িত? অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে এই লক্ষ্মী উপাসনার বিশ্বরূপ পরিবেশন করেছেন। মেক্সিকোর 'ছড়াম্মা', গ্রিক শস্যদেবী 'টাইকি', 'ডিমিটার', জোরোয়াসস্ট্রিয়ান দেবী 'আদির্সভঙ্গ' দেবী লক্ষ্মীর সমতুল্য। হয়তো বাঙ্গলার এই লক্ষ্মীর পুজোর ইতিহাস বহু প্রাচীন। আলো-আঁধারি থেকে তার প্রকৃত ইতিহাস তুলে আনতে হবে। তার সঙ্গে তুলে আনতে হবে সেই ইতিহাস, যেখানে বাঙ্গলার হিন্দুরা নানান কারণে যখন বিধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন, তখন হিন্দু রমণী কিন্তু গৃহলক্ষ্মীকে একেবারে ফেলতে পারেননি। জানা যায়, একটি লক্ষ্মী স্মৃতি নীরবে লুকিয়ে কুলুঙ্গিতে তুলে রেখেছেন। আজও তা হিন্দু ঘরানার মিসিং লিংক রূপেই রয়ে গেছে গৃহ ও মনের হারানো অন্দরে।

পুরাণে দেখা যায়, সমুদ্র মন্থনে অলক্ষ্মী দেবীর উৎপত্তি লক্ষ্মীর পূর্বে। তাঁর নাম 'নির্ঋতি'। তিনি কৃষ্ণবর্ণা, তিনি লৌহাভরণা। লোহার মূর্তি বলেই তিনি হয়তো লৌহযুগের সমসাময়িক। কিন্তু দেবী লক্ষ্মীর যে রূপ, তাতে তিনি 'হিরণ্যবর্ণাং হরিণাং সুবর্ণরজাস্রজাম'। তাঁর রং টকটকে সোনার মতো, তিনি সোনা ও রুপা গহনা পরিহিতা। শ্রী ও লক্ষ্মী যেভাবে জুড়ে লক্ষ্মী হয়েছেন, একইভাবে হয়তো অলক্ষ্মী আর লক্ষ্মী জুড়ে গিয়ে লক্ষ্মী হলেন। কারণ বাস্তুতন্ত্রে কোনো জীবকে একেবারেই নির্মূল করা যায় না। তাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং এভাবেই মূল ফসলকে নির্বিবাদে চয়ন করে নিতে হয়। ধানের জমির ইঁদুর যে একেবারেই নিঃশেষ করা যাবে না। কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, অনেক কৌমগোষ্ঠীর আমিষ খাবার এই ইঁদুরের মাংস এবং তার গর্তে থরে থরে সঞ্চিত ধান। ধান কাটার পর শাবল-কোদাল নিয়ে মাটির সুরঙ্গ অনুসরণ করে এই ইঁদুর ধরেন কোনো কোনো বনবাসী মানুষ, সংগ্রহ করে মুষিকে নিয়ে আসা ধান। এভাবেই ইকোসিস্টেমে ভারসাম্য বজায় থাকে। বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও ধানের জমির নানান তণ্ডুল জাতীয় আগাছার বীজ সংগ্রহ করে তার চাল খেয়ে বাঁচেন গরিব মানুষ। যেমন শ্যামাধান, কাউনধান, নানান মিলেট জাতীয় আগাছা। কোথাও জল ও সারের অভাবে সেই আগাছাই আংশিকভাবে চাষ করে দুর্ভিক্ষ দূর করে লোকসমাজ। তারাই হয়তো বহু প্রাচীনকাল থেকে মিলিয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর এই ধারণা। পৃথিবীতে অলক্ষ্মী বলে যা আছে, তা হলো আমাদের সমাজের বিড়ম্বনা, আমাদের ধর্মীয় বিপ্রতীপের চিত্র। আজকের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা হিন্দুজাতির এক ভারসাম্যের প্রকৃতি পূজা, সামাজিক মেলবন্ধনের উপাসনা। এই পুজো দীর্ঘজীবী হবেই। ❑

কাশীর চিরন্তন মহিমাদ্যুতি

শেখর সেনগুপ্ত

জগদ্‌গুরু আচার্য শ্রীমৎস্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ তীর্থভূমি কাশীতে একাধিকবার গমন করেছিলেন এবং তাঁর উদ্যমে সেখানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরপ্রতিম সেই মহামানবের পাদোদক আর পদধূলি অক্ষয়, অব্যয় ও অখণ্ড। এ আমার নিজস্ব অনুভূতির। যিনি যথার্থ হিন্দু, কাশীর প্রতি তাঁর টান থাকবেই। ভারতের প্রাচীন নগরীর মধ্যে কাশীর মাহাত্ম্য সর্বাধিক। একদিকে বহু সংখ্যক দেব-দেবীর মন্দির, অন্যদিকে রয়েছে একাধিক চতুষ্পাঠী, গঙ্গার ঘাট, একটির পর একটি আশ্রম— ইত্যাকার আকর্ষণ বুকে নিয়ে বারাণসী বিদেশিদের নিকটও বিশ্বের বিশিষ্ট 'লিভিং সিটি'র মধ্যে অন্যতম। যিনি ছিলেন আমার ব্যক্তিগত সুহৃদ, কলকাতা প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি, লেখালেখির জগতে সুপরিচিত, সেই গোপালকৃষ্ণ রায় আমাকে প্রায়শ বলতেন, 'চলো, আমরা একসঙ্গে কাশী গিয়ে দিনকয়েক কাটিয়ে আসি। ওখানকার বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালির সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।'

গোপালকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে আমার যাওয়া হয়নি। কারণ, গোপাল অকৃতদার হলেও আমি যে নিতান্ত পারিবারিক। হুট কথায় কেবল বন্ধুকে নিয়ে উড়ান দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশ্য এর আগে একাধিকবার কাশীতে গিয়েছি এবং কাশীর মহিমাদ্যুতি আমার কাছে চিরন্তন।

কাশীর উত্তরে বরুণা নদী, আর দক্ষিণে অসি নদী। এই দুই নদীকে গঙ্গায় মিশিয়ে দিয়ে নির্মিত হয়েছে হিন্দুদের একমেবাদ্বিতীয়ম্ তীর্থভূমি কাশী বা বারাণসী। কাশীর পরিচিতি বহু নামে। কাশী, বারাণসী, মোক্ষধাম, কাশিকা, স্বর্গপুরী, আনন্দকানন, পঞ্চতীর্থ— আরও কত নাম। সব নাম স্মরণেও নেই এই মুহূর্তে। মহাকবি, মহাসাধক তুলসীদাস কাশীতে বসেই হিন্দিতে লিখেছিলেন 'রামচরিতমানস'। পরিভ্রমণ রত শঙ্করাচার্য ভারতের নানা স্থান ছুঁয়ে কাশীতে পা রাখবার পর আর নির্বিকার থাকতে পারেননি; সার্বিক, অখণ্ড তৎপরতার সঙ্গে অদ্বৈতবাদের প্রচারে ব্রতী হলেন। ফলশ্রুতিতে তিনি আর অপরিচিত হয়ে থাকলেন না, স্বল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে গেলেন খ্যাতির শিখরে। এই কাশীতেই তর্কযুদ্ধে পরাজিত 'প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাঁচুমাচু মুখে শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণে পতিত হন এবং শ্রীচৈতন্যের নিকটই বৈষ্ণবধর্মে

দীক্ষা নেন। মহাসাধক ত্রৈলঙ্গস্বামী কাশীর গঙ্গবিধৌত তটভূমিকেই বেছে নেন তাঁর সাধনস্থলরূপে। মা আনন্দময়ী বারংবার ছুটে এসেছেন বারাণসীতে। প্রণবানন্দ মহারাজের কথা তো সূচনাতেই বলেছি। শ্রীরামকৃষ্ণও অভিভূত হয়ে পড়েন কাশীতে এসে। কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে তিনি সাক্ষাৎলাভ করেন স্বয়ং মহেশ্বর দেবাদিদেব মহাদেবের।

তিনি দেখলেন, স্বয়ং মহাদেব তাঁর এক মরণাপন্ন ভক্তকে 'তারকব্রহ্ম' মন্ত্র শোনাচ্ছেন। কাশীর মতো সাধনাশিক্ষার ওয়ার্কশপ

ভূভারতে দ্বিতীয়টি নেই। মধ্যযৌবনে স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে নিয়ে মাসাধিককাল অবস্থান করেছিলাম চুনারে। রাজা বিক্রমাদিত্য, শেরশাহ এবং মোগল সম্রাট হুমায়ুনের স্মৃতিবাহী বিশাল চুনারদুর্গের জৌলুস আজও অনেক। প্রতিদিন ওই দুর্গের চত্বরে আমি ঘুরঘুর করেছি। সেখানেই আগত অন্য একটি ভ্রমণপিপাসু বাঙ্গালি পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে এবং ওই পরিবারের কর্তার প্রস্তাবমোতাবেক একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে দুই পরিবারের সদস্য/সদস্যার প্রথম যাত্রা বারাণসীকে নিশানায় রেখে। সেই অনবদ্য অভিজ্ঞতা অদ্যপি আমার স্মৃতিতে জীবন্ত— আজকালকার দিনে আমার প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার লাভ-লোকসানের হিসেবে যা অলভ্য। দম ও ছোটার গতি পরিমাপের বাইরে। অ্যাকসিডেন্ট ঘটতেই পারতো যে কোনও মুহূর্তে এবং দুটি বঙ্গভাষী পরিবার তখন খাবি খেতে নির্ঘাত হিন্দিভাষী পুলিশি তদন্তের খোঁচায়। মূল আকর্ষণ তখন ঠাকুর বিশ্বনাথের মন্দির। শাস্ত্রীয় অভিধায় যা বিশ্বভৌগোলিক অভিধার বাইরে, সেই কাশীতে রয়েছে গণনাতীত অলিগলি। সকল গলিরই স্রোত গিয়ে থেমেছে সেই একটিই দিব্যস্থলে— দেবাদিদেব বিশ্বনাথের মন্দির। জ্ঞানবাপী মসজিদকে অতিক্রম করে জ্ঞানবাপী কূপের নিকট দাঁড়িয়ে ছিলাম বহুক্ষণ। অন্নপূর্ণা মন্দিরের মুখোমুখি রামমন্দির। রাম রয়েছেন বলেই হয়তো হনুমান ও বানর অত দৌরাত্ম্য। অন্নপূর্ণা মন্দিরের পিছনে রয়েছেন মহাদেব শুক্রেশ্বর। অদূরে প্রবাহিণী মা গঙ্গা। সেখানে স্নান সেরে মাতা ভবানী ও শঙ্করের আরাধনা করে থাকেন ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুরা। বাসনা যদি শুভ ও শুদ্ধ হয়, প্রাপ্তি নিশ্চিত। বিভিন্ন বয়সি মানব-মানবীকে দেখা যায় প্রার্থনামগ্ন অবস্থায়। কানে আসে পবিত্র 'শিবাষ্টকম্' স্তোত্র :

প্রভুম প্রাণনাথম্ বিভুম বিশ্বনাথম্
জগন্নাথ নাথম্ সদানন্দভাজম্।
ভবদ্ভব্য ভূতেশ্বরম্ ভূতনাথম্
শিবম শঙ্করম্ শম্ভু মিশানামিডে।।

আমি ইতিহাস ও অর্থনীতির নগণ্য ছাত্র। সংস্কৃত ভাষায় ন্যূনতম দখলও নেই। তবে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের কথঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত মগজে গেঁথে আছে ছাত্রজীবন থেকেই। দাসবংশের ইসলামি সম্রাট কুতুবউদ্দিন আইবক হিন্দুদের এই অনন্য, পবিত্র মন্দিরে ঢুকে নির্বিচারে অকথনীয় ভাঙচুর চালায়, হত্যালীলাও চলে লাগামহীন ভাবে। তথাপি পুরোহিতদের কঠিন প্রতিরোধকে ভেদ করে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনি। মরিয়া পুরোহিতরা শিবলিঙ্গটিকে স্থানান্তরে নিয়ে যেতে সমর্থ হন। সুলতানা রিজিয়া সিংহাসনে বসেই কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হুকুম দেন। কিন্তু তাঁর সেই নির্দেশ পালিত হবার আগেই তিনি স্বয়ং রাজনৈতিক ও পারিবারিক কোন্দলে পর্যদুস্ত হন। ইন্দোরের মহারানি অহল্যাবাঈ ১৭১৭ সালে কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরকে সুন্দরভাবে সংস্কার করে আরও গৌরবান্বিত এবং ধর্মপ্রাণারূপে পরিচিতি অর্জন করেন।

বারাণসীর অন্যতম আকর্ষণ হলো বিশ্বনাথ মন্দিরে 'সপ্তঋষি আরতি' অনুষ্ঠান, — যা প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য এই অধমের হয়েছে একাধিকবার। এই মহাআরতি আরম্ভ হয় ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সন্ধ্যা ৭টায় এবং তা চলে রাত সাড়ে আটটা অবধি। কাতারে কাতারে দর্শনার্থীরা আসেন টিকিট কেটে ওই আরতি দেখতে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং ভোলাগিরি আশ্রমের অনেক সন্ন্যাসীকে আমি দেখেছি তখন সমবেত হতেন। কাশীর বঙ্গসাহিত্য সমাজের ষান্মাসিক মুখপত্র 'বঙ্গসাহিত্য'-এর প্রধান সম্পাদক ড. বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার সেখানেই পরিচয় এবং তাঁরই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি সেই পত্রিকায় কয়েকবার লিখেছিও। আমার লেখা গল্প ও ভ্রমণবৃত্তান্তও ছাপা হয়েছে সেখানে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি বছর অতিক্রান্ত। এখনও জীবনের এই প্রান্তকালে কাশীর বিশ্বনাথধাম আমাকে টানে। হয়তো একদিন সপরিবারে আর একবার চলে যাব হিন্দুদের সেই মহাপুণ্যক্ষেত্রে। ◻

মরিচঝাঁপির চুয়াল্লিশ বছর

কী ছিল গণহত্যার সম্ভাব্য কারণ?

মরিচঝাঁপির গঠনমূলক কর্মকাণ্ডকে মান্যতা দিলে সেই ধ্বংসকাণ্ডের প্রেক্ষিতে তৈরি হতো এক সাংস্কৃতিক পরস্পর বিরোধ যা হতে দেওয়ার মনোবাসনা জ্যোতি বসুর আদৌ ছিল না।

দেবযানী ভট্টাচার্য

বিভাজন পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের পতন নিশ্চিত করার ব্রিটিশ পরিকল্পনা সফল হয়েছিল—

১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে বিভাজন-বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সমস্ত বিক্ষোভকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের দিশায় চালনা করেছিলেন জ্যোতি বসু। ১৯ জুলাই ১৯৪৮-এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদেশে এসেছিলেন যাঁরা, তাঁরা মান্যতা পেয়েছিলেন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে। কিন্তু ১৯৪৮-এর পরেও পূর্বপাকিস্তান থেকে এরাজ্যে অনবরত বাস্তুচ্যুত মানুষের ঢেউ। তাদের দেশ ও স্বজন, মান ও সম্পদ হারানোর যন্ত্রণা ও নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্কজনিত সমস্ত বিক্ষোভকে বিধ্বংসী আন্দোলনের রসদ বানিয়েছিলেন বসু। যেন বিক্ষোভ সমুদ্রের সব ঢেউয়ের মুঠি এক হাতে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

সেই সময়কার অফুরন্ত বিক্ষোভ আদতে পরিণত হয়েছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনের অফুরন্ত রসদে। বিভাজন পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলন তাই শান্ত হয়নি একদিনের জন্যও। সেই আন্দোলনের তীব্রতা এতটাই যে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার বাধ্য হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গকে 'প্রবলেম প্রভিন্স' বলে ঘোষণা করতে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো নিত্যনতুন অজুহাতে খেপিয়ে তোলা হচ্ছিল অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন মানুষকে। ফলে একে একে ভেঙে পড়ছিল সরকারি সংস্থা ও পরিকাঠামো ব্যবস্থার নিয়মনিষ্ঠা, কর্মসংস্কৃতি ও অনুশাসন। প্রবল ভাঙনের

সেই সবদিনে বিক্ষুব্ধ মানুষ আন্দোলনের নামে আদতে ভেঙে ফেলছিল নিজেদের ভবিষ্যত। ব্রিটিশ পরবর্তী শহর কলকাতার পতন নিশ্চিত করতে কমিউনিস্ট দৈত্য মাথাচাড়া দিয়েছিল। উইনস্টন চার্চিলের পরিকল্পনা সফল হয়েছিল জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে।

ব্রিটেনে চার্চিলের দ্বিতীয় টার্ম : পশ্চিমবঙ্গের ওপর মাশুল সমীকরণ নীতি ও শিল্প বিধ্বংসী কমিউনিস্ট রাজনীতির সাঁড়াশি আক্রমণ

১৯৫১ সালে আবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন উইনস্টন চার্চিল। ক্লেমেন্ট অ্যাটলির বিরুদ্ধে প্রচার করেন— 'দ্য ম্যান হু গেভ অ্যাওয়ে ইন্ডিয়া'। এদিকে স্বাধীনতা-উত্তর খাদ্যসঙ্কটের মোকাবিলায় নেহরু'র নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের ওপর আস্থা রাখা যায় না বিচার করে সেই বছরই জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তার পর ১৯৫৩-য় চার্চিল প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীনই

ফঃ ৫

কাশ্মীরে রহস্যমৃত্যু হয় শ্যামাপ্রসাদের এবং চার্চিলের প্রধানমন্ত্রিত্বের দ্বিতীয় টার্মের অবসান ঘটে ১৯৫৫ সালে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫-র সময়কালটিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ গ্রহণের প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৩ বার) ও সোভিয়েত ইউনিয়নের (১ বার) তরফ থেকে মোট চারবার পাওয়া সত্ত্বেও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। কেন এমন করেছিলেন তিনি, কেন মরিয়া প্রয়াস করেছিলেন ভারতের পরিবর্তে কমিউনিস্ট চীনের স্বার্থরক্ষার, তার সম্ভাব্য কারণ বিশ্লেষণ করে ইতিমধ্যেই 'স্বস্তিকা'য় লিখেছি 'অনুচ্চারিত ইতিহাসের রহস্যভেদ' শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ। ১৯৫২-এ জওহরলাল নেহরু চালু করলেন মাশুল সমীকরণ নীতি, যার ফলে ধ্বংস হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশের খনিজ সমৃদ্ধ এলাকার উৎপাদন শিল্পগুলি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো পশ্চিমবঙ্গ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে এহেন শিল্প বিধ্বংসী মাশুল সমীকরণ নীতির বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করতে জ্যোতি বসুকে দেখা যায়নি। একদিকে মাশুল সমীকরণ নীতি, অন্যদিকে লোক খেপানো কমিউনিস্ট আন্দোলন--- পশ্চিমবঙ্গের ওপর চালানো হয়েছিল উৎপাদন শিল্প বিধ্বংসী সাঁড়াশি আক্রমণ। এসব থেকে আন্দাজ করা দুরূহ নয় যে পশ্চিমবঙ্গের অর্থব্যবস্থার পতন কামনা করেই নেওয়া হয়েছিল একের পর এক সুপরিকল্পিত সব পদক্ষেপ।

খাদ্যসঙ্কটের দশক ও খাদ্য আন্দোলন

১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে শুরু করে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে চলেছিল খাদ্যসঙ্কট ও সেই সংক্রান্ত বিক্ষোভ। ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তু সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসঙ্কটকে বাড়িয়ে তুলেছিল এবং ১৯৫৯ ও ১৯৬৬-তে প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই সংক্রান্ত আন্দোলন যা দমনে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কড়া পুলিশি ব্যবস্থা পর্যন্ত নিতে হয়েছিল। অবিভক্ত বাঙ্গলার পূর্ব অংশ এবং অবিভক্ত পঞ্জাবের পশ্চিম অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পূর্ববঙ্গে উৎপাদিত ধান এবং পশ্চিম পঞ্জাবে উৎপাদিত গম হয়েছিল বিভাজনোত্তর ভারতের হাতছাড়া। উপরন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকে দেশের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল প্রভূত পরিমাণে ভারতীয় কৃষিপণ্য। তদুপরি ছিল খাদ্যসঙ্কটের সমাধানে জওহরলাল নেহরুর নেওয়া নানা ভ্রান্তনীতি। খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় সম্পূর্ণ বন্ধ করে খাদ্যশস্য বিতরণের বিলি বন্দোবস্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল নিয়ন্ত্রিত মূল্যের পাবলিক রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে যার ফলে দেখা দিয়েছিল মজুতদারির প্রবণতাও। কারণ নামমাত্র মূল্যে পাবলিক রেশনে খাদ্যশস্য বিক্রি করতে চাননি সে সময়ের অনেক জোতদারই। খাদ্যসঙ্কটের এহেন সময়ে তীব্রগতি লাভ করেছিল কমিউনিস্ট আন্দোলন।

খাদ্যসমস্যার বাস্তব অভিঘাতের তুলনায় সে সবের অতিরঞ্জিত উপস্থাপনা করেছিল তারা যার ফলে ১৯৫৯-এ কলকাতার বুকে পুলিশের গুলিতে মারা যান আন্দোলনরত প্রায় আশিজন সাধারণ মানুষ। খাদ্য আন্দোলনের এই সময়ে জ্যোতি বসু আবার তুলতে শুরু করেন জমিদার, জোতদারদের ভূসম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের দাবি। জমিদারদের জমি চাষিদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে খাদ্যসঙ্কট মেটানোর কথা বলেন জ্যোতি বসু যা পরবর্তীতে তিনি কার্যে পরিণত করেন ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পর। জ্যোতি বসুর 'অপারেশন বর্গা'র মধ্যেই বুঝি-বা সুপ্ত ছিল মরিচঝাঁপি গণহত্যার বীজ।

সমসাময়িক কমিউনিস্টদের অন্তর্নিহিত জাতীয়তাবাদ

সমসাময়িক ভারত ইতিহাস পর্যবেক্ষণে বোঝা যায় ব্রিটিশ বিরোধী হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অগ্রবর্তী হিন্দু বাঙ্গালির পরিণতি স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ভালো হয়নি। তাঁদের এক বিরাট অংশ সেলুলার জেলে থাকাকালীন ব্রিটিশের উদ্যোগে দীক্ষিত হয়েছিল কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে এবং জেল থেকে বেরিয়ে যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে। অর্থাৎ জেল থেকে ছাড়া পাওয়া ব্রেইনওয়াশড বিপ্লবীদের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের প্রয়োজনেই এ দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিতে হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারকে। আর যাঁরা কমিউনিস্ট হননি, তাঁদের প্রায় সবাই তলিয়ে গেলেন বিস্মৃতির অতলে। এমনকী বুকের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আগুনের উদ্ভাস নিয়ে কমিউনিজমের মধ্যেই যাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন নিপীড়িত মানুষের পুনরুত্থান, তাঁরাও বামফ্রন্ট সরকারের পশ্চিমবঙ্গে ব্রাত্য হলেন। ইলামিত্র— তেভাগা আন্দোলনের অবিসংবাদিত কমিউনিস্ট নেত্রী ১৯৬২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত ছিলেন স্বাধীন ভারতের বিধায়ক। ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর বিধায়ক হওয়ার সুযোগ পাননি আর একবারের জন্যও। ক্ষমতায় এসে একে একে সেই সব কমিউনিস্টদের ঝেড়ে ফেলেছিল বামফ্রন্ট সরকার যাঁরা কমিউনিস্ট হয়েও নিজেদের অজান্তেই ভাবজগতে লালন করতেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্পিরিট। বহু সাধারণ মানুষ এহেন জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্টদের দেখে শ্রদ্ধাবান হয়েছিলেন কমিউনিজমের আদর্শ সম্পর্কে অথচ কমিউনিজমের প্রকৃত রূপ সাধারণ মানুষের চোখের সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে শুরু করে ১৯৭৭-এ জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার বেশ কিছুদিন পর থেকে।

দণ্ডকারণ্য থেকে মরিচঝাঁপি হয়ে বাঘের পেটে—বাঙ্গালি উদ্‌বাস্তুর ভাগ্যের পটপরিবর্তন

১৯৭৭-এ দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরে এসেছিলেন প্রায় দেড়লক্ষ উদ্‌বাস্তু মানুষ। কিন্তু তাঁদের গ্রহণ করার ইচ্ছা বামফ্রন্ট সরকারের তখন আর ছিল না। তাই অবিলম্বে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয় সরকারের তরফ থেকে। কিন্তু এঁদের মধ্যেকার বেশ কয়েক হাজার মানুষ এক চিলতে মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের আশায় তার মধ্যেই চলে যান পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ সীমান্তে হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, জিওনখালি অঞ্চলগুলিতে। আর একদল যান মরিচঝাঁপি দ্বীপে, সংখ্যায় তাঁরাও ছিলেন বেশ কয়েক

হাজার। যখন পৌঁছন মরিচঝাঁপিতে দ্বীপে তখন কেবল ঝোপঝাড়। তারপর তাঁরা আপন উদ্যমে গড়ে তোলেন দ্বীপটিকে। দু' বছরের মধ্যে গড়ে তোলেন স্কুল, এমনকী স্বাস্থ্যকেন্দ্রও।

মূল প্রশ্ন, কেন গণহত্যা?

রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে মনুষ্য বসতি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে— এমনই বলা হয়েছিল জ্যোতি বসুর প্রশাসনের তরফ থেকে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ তথা পুলিশবেশী হত্যাকারীরা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করার অপরাধে দ্বীপবাসীদের হত্যা করেছিলেন তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। জবরদখলকারী হিন্দু উদ্‌বাস্তুদের উৎখাত করার জন্য বামফ্রন্টের সরকারি প্রয়াস অমানবিক, অনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে চরম অবিচার হলেও প্রশাসনিক যুক্তিতে এতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু উৎখাতের লক্ষ্যে গণহত্যার কোনো প্রশাসনিক যৌক্তিকতা নেই।

১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া ভেঙে যখন তৈরি হয় কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া মার্কসিস্ট, জ্যোতি বসু তখন বলেছিলেন, 'এবার তৈরি হতে চলেছে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি।' 'প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি' অর্থাৎ প্রয়োজনে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর নামে গণহত্যাতেও যারা পিছপা হবে না। সেই 'রিয়েল কমিউনিস্ট পার্টি' গড়ার শপথ যে যথাযথ পালন করেছিলেন জ্যোতি বসু, বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের হিংস্রতার ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেয়। হ্যারল্ড লাসকির লেকচারমুগ্ধ জ্যোতি বসু রাজনৈতিক ভাবেও বিশ্বাসী ছিলেন 'ডায়রেক্ট অ্যাকশনে' এবং পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের মাত্র দু' বছরের মধ্যেই তাঁর সামনে একরকম অপ্রত্যাশিতভাবেই এসে গিয়েছিল এ রাজ্যের বুকে কমিউনিস্ট 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর রাজনৈতিক নজির গড়ার সুযোগ। 'বিয়ের প্রথম রাতেই বেড়াল মারা'র জন্য হিন্দু বাঙ্গালি উদ্‌বাস্তুই ছিল সফট টার্গেট, কারণ নেহরুর ভারতে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু বাঙ্গালি উদ্‌বাস্তুদের আদতে স্থান দিতে চাওয়া হয়নি।

বেঁচে ফিরে আসা জ্যোতির্ময় মণ্ডল ও সন্তোষ সরকার।

'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' মরিচঝাঁপিতেই কেন?

এমন নয় যে কেবল মরিচঝাঁপির হিন্দু বাঙ্গালি উদ্‌বাস্তুরাই ছিল এ রাজ্যের একমাত্র জবরদখলকারী উদ্‌বাস্তুগোষ্ঠী। এমন জবরদখল উদ্‌বাস্তু কলোনি পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়েছিল বহু। কিন্তু কমিউনিস্ট ডায়রেক্ট অ্যাকশনের দৃষ্টান্ত স্থাপনের তাগিদ থেকে গণহত্যার টার্গেট হিসেবে মরিচঝাঁপিকেই কেন বেছে নেওয়া হলো, তার আদত কারণ উপলব্ধি করতে জ্যোতি বসুর ভূমি সংস্কার প্রকল্প 'অপারেশন বর্গা'র ধারণাটি স্মরণ করা প্রয়োজন। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিতে 'অপারেশন বর্গা'র আওতাভুক্ত গ্রামবাঙ্গলার ছোটো কৃষক আর মরিচঝাঁপির কৃষিজীবী, উদ্‌বাস্তু মানুষের মধ্যেকার পার্থক্য অনুধাবন করতে না পারলে মরিচঝাঁপির গণহত্যার আদত কারণ উপলব্ধি করতে পারা সম্ভব নয়।

অপারেশনবর্গা—'শ্রেণীশত্রু' জমিদারের জমি দখল, ছোটো কৃষকের ক্ষমতায়ন ও ভোটব্যাংক গঠন

'অপারেশন বর্গা'র মাধ্যমে জমিদারদের (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী 'বুর্জোয়া' শ্রেণী) হাত থেকে তাঁদের পুরুষানুক্রমিক স্থাবর জমিজমা পরোক্ষে এক রকম কেড়ে নিয়ে তা কার্যত বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভাগচাষি বর্গাদারদের মধ্যে। আইনি বন্দোবস্ত যা করা হয়েছিল তাতে এ হেন বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জমির মালিকানা কাগজেকলমে ভূস্বামীর হাতে থাকলেও কার্যত তা চলে যায় ভাগচাষির মারফত বামফ্রন্টের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে। ভূস্বামীর যে জমি ভাগচাষি চাষ করত, তার ওপর ভাগচাষি বা বর্গাদারের আইনসিদ্ধ ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে তাকে সচেতন করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। অতঃপর ভাগচাষিদের নাম ও জমির খতিয়ান রেজিস্ট্রি করা হয় যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এক অধিকার সচেতন ভাগচাষি সম্প্রদায় যারা হয়ে দাঁড়ায় বামফ্রন্ট সরকারের ভোটব্যাংক। এহেন ব্যবস্থা হওয়ার আগে জমি মালিকদের কারুর কারুর তরফ থেকে ভাগচাষিদের ওপর প্রকৃতই চলত অন্যায় শোষণ। অসময়ে তাদের উৎখাত করত ভূস্বামী যার প্রতিবাদ করার উপায়, সচেতনতা, সাহস বা সামর্থ্য গরিব কৃষকের ছিল না। 'অপারেশন বর্গা'র পর এ হেন শোষণ বন্ধ হয় এবং রাজ্যের কৃষিজমি কার্যত

বেরিয়ে যায় আদত ভূস্বামীবর্গের হাত থেকে। বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডিং রেভেনিউ অ্যাক্ট ১৯৭৯ এবং রেভেনিউ রুলস ১৯৮০ পাশ করে আইনি বন্দোবস্ত পাকা করা হয় যাতে জমির মালিকনার হাতবদলের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকতে পারে ভাগচাষিদের ওপরেও। পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে দেখলে জ্যোতি বসুর এহেন ভূমিসংস্কার আদতে এক একজন ব্যক্তি কৃষকের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নয়, বরং সমষ্টিগত ভাবে তাদের জীবন ও জীবিকার ঠিকাদার বদল তথা গ্রামবাঙ্গলার ভূসম্পদের হাত বদল।

'অপারেশন বর্গা'র ফলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অশান্তিমূলক তথা হিংসাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুযোগ গ্রামবাঙ্গলার ভাগচাষিদের জন্য তৈরি হলেও প্রকৃত ক্ষমতায়ন তাদের হলো না। কারণ জমি চষতে জানলেও 'সবুজ বিপ্লব'-উত্তর কৃষিবিদ্যা বাঙ্গলার ছোটো চাষিদের জানা ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে 'অপারেশন বর্গা' শুরু হওয়ার ১৩ বছর আগে, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রধানমন্ত্রিত্বে ১৯৬৫ সাল থেকেই ভারতবর্ষে শুরু হয়ে গিয়েছিল 'সবুজ বিপ্লব', যার ফলে বিভাজনোত্তর ভারতবর্ষে কৃষিপণ্য উৎপাদনে এসেছিল জোয়ার এবং এদেশ থেকে অনেকখানি দূর হয়েছিল স্বাধীনতাপূর্ব ও তৎপরবর্তীকালের খাদ্যসঙ্কট। 'অপারেশন বর্গা'র পর গ্রামবাঙ্গলার ভাগচাষিও অন্যান্য কৃষিসহায়ক সম্পদের ব্যবহার জানতে বামফ্রন্ট সরকারের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হলো। অর্থাৎ 'অপারেশন বর্গা'র বহু চর্চিত সাফল্যের কতখানি 'অপারেশন বর্গা'র সাফল্য আর কতখানি 'সবুজ বিপ্লব'-এর তা পৃথক গবেষণার বিষয়।

'অপারেশন বর্গা'র ফলে ভাগচাষি জমি মালিকের শোষণ থেকে মুক্ত হলেও সরকারের থাবার মধ্যে ঢুকতে বাধ্য হয়। পূর্বে প্রতি ভাগচাষিকে যেখানে চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতে নির্ভর করতে হতো ভূস্বামীর ওপর, 'অপারেশন বর্গা' পরবর্তীকালে সেই নির্ভরতাই তৈরি হলো বামফ্রন্টের রাজনৈতিক মেশিনারির ওপর, উপরন্তু চাষিরা নিজেও পরিণত হলো বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম মেশিনারিতে। ব্যক্তি চাষির অর্থনৈতিক উন্নয়ন বড়ো একটা না হলেও এর ফলে বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্মীলাভ হলো বলা যায়। সবুজ বিপ্লবোত্তর কৃষিপ্রযুক্তির ব্যবহারে গ্রাম বাঙ্গলার অসংখ্য ছোটো ভাগচাষির হাত দিয়েই ফসল উৎপাদনে জোয়ার আসে। খাদ্য সঙ্কটে জর্জরিত যে পশ্চিমবঙ্গ একদা আমদানি করত খাদ্যশস্য, 'অপারেশন বর্গা'র পরবর্তীতে সেই রাজ্য শুরু করেছিল খাদ্যশস্য রপ্তানি। কিন্তু এর প্রকৃত কৃতিত্ব 'সবুজ বিপ্লবের' নাকি 'অপারেশন বর্গা'র? 'সবুজ বিপ্লব' উত্তর কৃষি প্রযুক্তির কারণে অপারেশন বর্গা না হলেও কি পশ্চিমবঙ্গের উর্বর ভূমিতে কৃষিজ উৎপাদনের জোয়ার এমনিতেই আসত না? যেমন এসেছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যেমন পঞ্জাব, হরিয়ানা বা উত্তরপ্রদেশে?

রাজ্যের জমিদার শ্রেণীর হাত থেকে ভূসম্পদ কার্যত কেড়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে প্রায় কপিবুক মার্কসিস্ট নীতি অনুসরণ করেছিলেন জ্যোতি বসু। গ্রামবাঙ্গলার ভূমিহীন কৃষক (তথাকথিত প্রলেতারিয়েত) এই কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল মার্কসিস্ট শাসকের বোড়ে হিসেবে। ১৯৪০ সাল থেকে কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে বেঙ্গল প্রভিন্সের শ্রমিকের কর্মমননের নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়ে যেভাবে শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়েছিলেন জ্যোতি বসু এবং তাঁদের মনে জন্ম দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের বিরোধিতার মনোভাব, ৩৭ বছর পর অনুরূপ নীতির প্রয়োগে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদেরকেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় বামফ্রন্ট সরকার, ভূস্বামী ও ভাগচাষিদের পরস্পরের থেকে বিযুক্ত করে ও উভয়ের মধ্যে বিভেদ বাঁধিয়ে।

মরিচঝাঁপি : বামফ্রন্টের রাজনৈতিক পরিকল্পনাকে চ্যালেঞ্জ

শ্রমিক, কৃষক আদি মেহনতি মানুষেরা বাস্তবে রয়ে গিয়েছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের পোস্টার মেটেরিয়াল হয়ে। সবুজ বিপ্লবোত্তর কৃষিবিদ্যার জ্ঞান ও কৃষিজ পণ্যের লাভজনক বিপণনের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ছোটো চাষিকে আত্মনির্ভর করে তোলা জ্যোতি বসুর ভূমিসংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁদের সম্পদ সৃষ্টিকারী পরিশ্রমী সত্তার প্রতি সম্মানবোধ থেকে নয়, বরং মেহনতি হওয়ার মূল কারণ যে দারিদ্র্য, সেই দারিদ্র্যজনিত দুর্বলতাকেই রাজনীতির মূলধন করা হয়েছিল এ রাজ্যে। অথচ মরিচঝাঁপির সহায়সম্বলহীন, উদ্‌বাস্তু মানুষগুলো তখন শুরু করতে চেয়েছিল শূন্য থেকে, সরকারের কাছ থেকে আশা করেছিল দ্বীপভূমিতে বাস করার অনুমতিটুকু মাত্র। তখন তাদের পাশে দাঁড়ানোর কোনো সুনিশ্চিত পরিকল্পনা বামফ্রন্ট সরকারের ছিল না। অতঃপর যখন স্পষ্ট হলো যে মরিচঝাঁপির কৃষকবর্গ চাষের খুঁটিনাটির জন্য বামফ্রন্ট সরকারের মুখাপেক্ষী নয়, তারা নিজেরাই জানে সব, এমনকী নোনা মাটিতে সোনা ফলাতেও তারা পারদর্শী— তখন হয়তো-বা অন্তরাত্মা কেঁপে গিয়েছিল মার্কসিস্ট শাসকের। গড়ে তোলার অফুরন্ত উর্জা এদের মধ্যে, অথচ জ্যোতি বসু এসেছিলেন ভাঙনের পথ বেয়ে। সুভাষচন্দ্র বসুর রাজ্যের মানুষের মনে ধ্বংসত্মক পরিবর্তন আনবার দায়িত্ব নিয়েই বুঝি তিনি এসেছিলেন এ রাজ্যে। ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমে অন্তত সেই ইঙ্গিতই বহন করে। আত্মশক্তিতে বলীয়ান মরিচঝাঁপির মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো এহেন জ্যোতি বসুর পক্ষে বুঝি সম্ভব ছিল না।

১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারির সপ্তাহটিতে মরিচঝাঁপি দ্বীপে আদতে তাই হত্যা করা হয়েছিল উদ্যমী বাঙ্গালি নমঃশূদ্রদের উদ্যম ও ঐক্যের স্পিরিটকেই। হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব, তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা, চিরবিকাশশীল মেধা, ইতিবাচক জাতীয়তাবাদী ভাবধারা--- এসবকে আর জায়গা দিতে চাওয়া হয়নি বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গে কারণ এ রাজ্যের রাজনীতিতে বামফ্রন্টের আসার উদ্দেশ্যই ছিল পশ্চিমবঙ্গ তথা হিন্দু বাঙ্গালির রূপ ও মননের পরিবর্তন ঘটানো। বাঙ্গালির স্বাধীনতাপূর্ব চিন্তন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটানোই ছিল বামফ্রন্টের প্রজেক্ট। বামফ্রন্টিয় পশ্চিমবঙ্গের কোনো প্রান্তে বহু মানুষ একত্রিত হয়ে নিজ উদ্যমে গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে, এমন সাহস হিন্দু বাঙ্গালি যেন আর কখনও না দেখায় সেই বার্তা দিতেই

কমিউনিস্ট নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের মাধ্যমে মরিচঝাঁপির মানুষগুলোকে দেওয়া হয়েছিল দৃষ্টান্তমূলক চরম শাস্তি। মানবতা ও বিশ্বাসঘাতী হিংস্রতার প্রতি রাজ্যজোড়া মানুষের সহ্যের সীমাকেও সেই সুযোগে বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল এক ধাক্কায় অনেকখানি। মানুষকে বার্তা দেওয়া হয়েছিল যে কেবলমাত্র ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্টেই শেষ নয়, এ রাজ্যে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' ঘটতে পারে বার বার, অতএব বুঝদার হতে হবে মানুষকে। বামফ্রন্টের ছত্রছায়াই একমাত্র গন্তব্য, তা ভিন্ন আপন অস্তিত্ব জানান দিতে চাইলে থাকবে 'মরিচঝাঁপি দাওয়াই'। 'মাস্টারমশাই আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি' 'আতঙ্ক'-এর সেই শুরু। অতপর শুরু হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্জলি যাত্রা।

'ওরা ভয় পেয়েছে রোবসন'

মরিচঝাঁপির আত্মনির্ভর, অতি দক্ষ, উৎপাদনশীল কৃষকেরা মার্কসিজম প্রসারের রাজ্যে সমূহ বিপদ বলে প্রতিভাত হয়েছিল। শ্রেণীবিভেদজনিত শোষক ও শোষিতের ধারণাই মার্কসিজমের মৌলিক ভিত্তি। কৃষক যদি দরিদ্র অথচ অতি দক্ষ হয় এবং সম্পদহীন, জনহীন এক ভূখণ্ডে সম্পদ উৎপাদনে স্ব-উদ্যোগে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে, শোষক-শোষিতের দ্বিমাত্রিক ধারণাটি সেক্ষেত্রে পর্যুদস্ত হয়। নিজেদের কর্মোদ্যমের দ্বারা মার্কসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল মরিচঝাঁপির মানুষগুলো। এহেন লোকেদের বাঁচিয়ে রেখে মার্কসীয় তত্ত্বকে এমন প্র্যাকটিক্যাল চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে দেওয়া জ্যোতি বসুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। 'অপারেশন বর্গা'র আওতায় রেজিস্ট্রিকৃত ভাগচাষিরা যখন কৃষিপণ্যের উৎপদনের প্রতিটি পদক্ষেপে নির্ভর করে থেকেছে সরকারের ওপর, আত্মশক্তিতে বলীয়ান মরিচঝাঁপির মানুষেরা তখন এনেছিলেন প্রকৃত বিপ্লব।

পিপলস্ থিয়েটারের শিল্পীদের দিয়ে মুক্তমঞ্চে বিপ্লবের গান অহরহ গাওয়ালেও মরিচঝাঁপি দ্বীপে প্রকৃত বিপ্লব ঘটতে দেখে আদতে ভয় পেয়ে গিয়েছিল জ্যোতি বসুর দল। ঝোপঝাড়ে ভরা নোনামাটির দ্বীপে সোনা ফলিয়ে দু'বছরের মধ্যে দ্বীপবাসীরা গড়ে তুলেছিলেন অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক গ্রামস্বরাজ ব্যবস্থা। উদ্‌বাস্তু সর্বহারার এমন বেপরোয়া লক্ষ্মীর আরাধনাকে ভয় পেয়েছিল লক্ষ্মীছাড়ার দল। দিকে দিকে পূর্ববঙ্গীয় উদ্‌বাস্তুরা এমন উৎপাদনশীল হয়ে উঠতে থাকলে পশ্চিমবঙ্গকে পতিত করার পরিকল্পনা ফলপ্রসু হবে না, বুঝতে দেরি হয়নি তাদের।

মরিচঝাঁপি : সনাতন ভারতীয় অর্থব্যবস্থার দিশানির্দেশ বনাম মার্কসীয় তত্ত্ব

সম্পদশালীর সম্পদ সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে মার্কসিজমের সাফল্য। কিন্তু সমষ্টির কল্যাণে প্রয়োজনানুগ পরিমাণে সম্পদ সৃষ্টির সনাতন ভারতীয় নীতিটি পৃথক। কপর্দকহীন মানুষ যদি সমষ্টিগত ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রতি ব্যক্তির গুণ মেধাগত বৈশিষ্ট্যের যথাযথ বিকাশের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে শূন্য থেকে, তবে সেই পন্থাকেই মোটের উপর আর্থসামাজিক হিন্দুত্ববাদ বলা যেতে পারে। অতি স্বল্প এক পরিসরে এমন একখানি প্রায়-স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থসামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল মরিচঝাঁপি এবং অজান্তে চ্যালেঞ্জ করে বসেছিল মার্কসীয় তত্ত্বকে। অসহায় মানুষের অসহায়তার নেতিবাচক পণ্যায়নের মাস্টার প্ল্যান নিয়ে ময়দানে নেমেছিলেন জ্যোতি বসুরা। কিন্তু হতভাগ্যের গান কণ্ঠে নিয়ে অদৃষ্ট জয়ের প্রত্যয় নিয়ে ঝাঁপায় যারা, তাদের পুরুষকারের দাপট হজম করা জ্যোতি বসুদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অসহায়তা যদি প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে সেই অসহায়তার তখন আর নেতিবাচক পণ্যায়ন হয় না। মরিচঝাঁপির কর্মোদ্যোগী মানুষেরা রচনা করেছিল মার্কসিজমের কাউন্টার ন্যারেটিভ। দুইটি মাত্র বছরে তাঁদের সাফল্য 'শোষিক-শোষিত' মার্কসীয় তত্ত্বের অসারতার প্রদর্শনী হিসেবে দেখা দিয়েছিল। উদ্‌বাস্তু নমঃশূদ্র মানুষ স্ব-উদ্যোগে গড়ে তুলবে জনপদ, অন্য কারুর সম্পদ ছিনিয়ে না নিয়েই 'বুর্জোয়াকরণ' ঘটবে প্রলেতারিয়েতের, মার্কসীয় তত্ত্বকে কার্যত খারিজ করে মাথা তুলবে আর্থসামাজিক হিন্দুত্ববাদ, এমন বিপজ্জনক উদাহরণ প্রস্তুত হতে দেওয়া সম্ভব ছিল না বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে।

কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক যে পতনের মুখে পশ্চিমবঙ্গকে ঠেলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এবং জ্যোতি বসুর ওপর দেওয়া হয়েছিল তার রূপায়ণের ভার, মরিচঝাঁপির গঠনমূলক কর্মকাণ্ডকে মান্যতা দিলে সেই ধ্বংসকাণ্ডের প্রেক্ষিতে তৈরি হতো এক সাংস্কৃতিক পরস্পর বিরোধ যা হতে দেওয়ার মনোবাসনা জ্যোতি বসুর আদৌ ছিল না। প্রকৃত অন্ত্যোদয় ঘটতে দেওয়া মার্কসিজমের অস্তিত্বের স্বার্থেই সম্ভব ছিল না জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে। তাই হয়তো পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দ্বীপ খালি করানোর। হয়তো স্পষ্ট করে নয়, বলেছিলেন প্রকারান্তরে যার পর পুলিশ তথা পুলিশবেশী হার্মাদ বাহিনী কাজ করেছিল নিজেদের মতো করে আর মৃতদেহ লোপাট করতে ব্যবহার করেছিল সুন্দরবনের বাঘকে।

মরিচঝাঁপি গণহত্যা : সুপ্ত নেতাজী বিদ্বেষও?

দণ্ডকারণ্য ছেড়ে আসা মানুষগুলো মরিচঝাঁপি দ্বীপের নাম রেখেছিলেন নেতাজী নগর। অর্থাৎ তাঁদের উদ্যম ও প্রেরণার উৎস ছিলেন নেতজী সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজীর আগুন বুকে নিয়ে বিনা সরকারি সহায়তায় আপন উদ্যমে মানুষগুলো গড়ে তুলেছিলেন বর্ধিষ্ণু এক জনপদ। সেই কি তবে কাল হয়েছিল তাঁদের? সুভাষের অন্তর্ধানের ৩২ বছর পরেও ভিটেমাটিচাঁটি হওয়া মানুষ যদি তাঁর নামটি মাত্র স্মরণ করে এমন প্রবল উদ্যমী হয়ে উঠতে পারে, সুভাষ বসুকে 'তোজোর কুকুর' বলে গাল দিয়েছিল যারা তাদের পক্ষে কি তা স্বস্তিদায়ক হতে পারত? যে মানুষকে উদ্যমহীন করতেই চাওয়া হচ্ছিল, নেতাজীর নাম মনে মনে জপ করে তারা মহা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠলে শাসকের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। বামফ্রন্ট রাজত্বের শুরুতেই তাই কি বার্তা দিয়েছিলেন জ্যোতি বসু যে বামফ্রন্টের অনুমতি ছাড়া নেতাজীর নাম পর্যন্ত নেওয়া যাবে না এ রাজ্যে? □

মহাজীবন

নবাঙ্কুর

নেতাজীর স্বপ্নের ভারতের রূপকার
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

ছোটো বন্ধুরা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নাম শুনলেই আমাদের মনে প্রথম যে ভাবটি ফুটে ওঠে তা হলো দেশপ্রেম। যদি প্রশ্ন করা হয়, আগামী ভারত নেতাজীকে কী কারণে মনে রাখবে? যদি প্রশ্ন ওঠে, এদেশের যুবসমাজ তাঁর কাছ থেকে কী বিষয়ে প্রেরণা পেতে পারে? যদি মনে প্রশ্ন জাগে, নেতাজীর জীবনের লক্ষ্য ও আধার কী ছিল? তাহলে এককথায় চোখ বন্ধ করে বলা যায় তা হলো দেশপ্রেম। তাঁর সারা জীবনের কর্ম, ধর্ম, স্বপ্ন সবকিছুই ঘিরে ছিল তাঁর জন্মভূমি দেশমাতৃকা ভারতবর্ষ। দেশমায়ের চরণতলে তিনি জীবন,যৌবন, ধন, মান, সুখ সবকিছুই উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর তিনি তাঁর মেজো বউদি বিভাবতী দেবীকে চিঠিতে লিখছেন, ''এক বৎসরকাল দেশান্তরিত হয়ে আমি অনুভব করেছি আজ আমার জন্মভূমি আমার নিকট কত প্রিয়, সুন্দর হয়ে উঠেছে। আজ মনে হচ্ছে জন্মভূমিকে এখন যত ভালোবাসি, জীবনে এত ভালোবাসি নাই। আর সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির জন্য যদি কষ্ট সইতেই হয়, সে কি আনন্দের বিষয় নয়? আর সে পাওয়ার মধ্যে কি কম আনন্দ?'' এতেই বোঝা যায় অন্তরে-বাইরে, শয়নে-জাগরণে, কর্মে-কল্পনায় সবকিছুতে দেশই ছিল তাঁর আরাধ্যা দেবী।

গত ৯৮ বছর ধরে সারা দেশে নেতাজীর সেই স্বদেশ সাধনার অনুসরণ করে চলেছে যে সংগঠন তার নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এই সংগঠনের প্রায় পঁচাত্তর হাজার শাখায় লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক প্রতিদিন বুকে হাত দিয়ে প্রার্থনা করে— 'হে স্নেহময়ী মাতৃভূমি, তোমার কাজে আমার এই শরীর নিঃশেষ হয়ে যাক, তোমাকে বারংবার প্রণাম করি।' তারা কোনোদিন নিজের কাজের প্রচার করেনি। বরং বালক-কিশোর-তরুণদের মনে নেতাজীর আদর্শ ও দেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়ে চলেছে। স্বয়ংসেবকরা নেতাজীর মতোই এই দেশকে স্বর্গাদপি গরীয়সী মনে করে। তাদের স্বপ্ন একটাই, মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী করা। তাই প্রতিদিনের শাখায় তারা বালক-কিশোর-তরুণদের দেশের মহাপুরুষদের সঙ্গে নেতাজীর ত্যাগ, তিতিক্ষা ও বীরত্বের কাহিনি শোনায়। শোনায়, আইসিএস পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েও বিদেশির গোলামি না করার জন্য কীভাবে সংকল্প করেছিলেন। শোনানো হয়, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেন সাহেবের ভারতীয়দের অপমানের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার ঘটনা। শোনানো হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বের গর্বিত ইতিহাসের কথা, যা শুনে আগামী প্রজন্ম নেতাজীর মতো দেশভক্ত হবে, দেশের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে শিখবে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ মানুষ গড়তে চায়, সে মানুষ সুভাষের মতো হবে। সুভাষ ছাত্রজীবনে বন্ধুদের নিয়ে মহামারীর সময় জীবনের মায়া ত্যাগ করে মানুষের সেবা করেছেন। তিনি মানুষের সেবার জন্যই জীবনপাত করে গেছেন। তাঁরই উত্তরসাধক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আজ সারা দেশে এক লক্ষেরও বেশি সেবাপ্রকল্পের মাধ্যমে নিঃশব্দে মানুষের সেবা করে চলেছে। অন্ধ্রের ঝঞ্ঝা হোক, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্প, কেরালার বন্যা, কোথাও ট্রেন বা বিমান দুর্ঘটনা অথবা করোনা মহামারী—সবেতেই তারা দুর্গত মানুষের সেবায় সবার আগে উপস্থিত। সেখানে ধর্ম,সম্প্রদায় ভেদ নেই, সবাই সমান। শুধুই সেবা। কারণ তাদের কাছে 'ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার রক্ত।'

এই স্বপ্নই তো নেতাজী দেখেছিলেন। যে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে তিনি কঠোর অনুশাসনে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, সেই একই অনুশাসনে সঙ্ঘের শাখায় শাখায় তৈরি হচ্ছে নব তরুণের দল। তাদের কণ্ঠে উদ্‌ঘোষ—ভারতমাতা কী জয়। নেতাজীর আধ্যাত্মিক গুরু বলেছিলেন দেশজননী ভারতমাতাই আমাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী। এই বাণী নেতাজী নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করেছিলেন। তাই স্বামীজী ও নেতাজীর যোগ্য উত্তরসূরী যদি কেউ হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে তা হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

ভারতের বিপ্লবী

পারুলবালা মুখোপাধ্যায়

বিপ্লবী পারুলবালা মুখোপাধ্যায় ১৯১৫ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি বাড়ি ঢাকায়। বিপ্লবী পূর্ণানন্দ দাসের হাত ধরে তিনি বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। ছদ্মনাম গ্রহণে তিনি পটু ছিলেন। সহকর্মীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বোমা, বিস্ফোরক তৈরি, লাঠিখেলা ইত্যাদিতে তিনি পারদর্শী হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালে তাঁর নামে মামলা চলে। ১৯৩৯ সালে তিনি মুক্তি পান। মুক্তিলাভের পর তিনি নিঃসঙ্গ জীবন কাটান। ১৯৯০ সালের ২০ এপ্রিল তাঁর দেহাবসান ঘটে।

জানো কি?

- বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, মরিচী, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু এই সাতজন ঋষি হলেন সপ্তর্ষি।
- পাণ্ডবজননী কুন্তীর আসল নাম পৃথা।
- দেবগুরু বৃহস্পতি এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য।
- সমুদ্র মন্থনের সময় কৌস্তভমণি উঠেছিল।
- শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য।
- অহল্যা, তারা, কুন্তী, মন্দোদরী ও দ্রৌপদীকে পঞ্চকন্যা বলা হয়।
- এক সময় শ্মশানে চণ্ডালের কাজ করেছিলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র।

ভালো কথা

আমাদের ছাদ বাগান

আমাদের ছাদ বাগানটি খুব সুন্দর। বাবা আমাদের বাগানের গাছগুলিকে খুব যত্নসহকারে পরিচর্যা করেন। মা সন্ধ্যাবেলা গাছগুলিতে জল দেন। আমার বাবা গাছগুলিকে সতেজ রাখার জন্য জৈব সার দেন। বাবা এগুলি বাড়িতে তৈরি করেন। আবার অনেক সময় অনলাইন থেকে কেনেন। আমাদের বাগানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ফল ও ফুল হয়। যেমন পেয়ারা, বেদানা, আম, লিচু, আতা, সাপাটু ইত্যাদি ফল হয়। এছাড়াও নানারকম ফুল ফোটে। যেমন-গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, টগর, জুঁই, কেতকী ইত্যাদি। কিছু ফল আমরা সারাবছর পায়। তাদের মধ্যে পেয়ারা এবং লেবু সবচেয়ে বেশি চাহিদা পূরণ করে। এই গাছগুলি ছোট-বড়ো বিভিন্ন টবে লাগানো আছে। আমি চাই আমরা যেন সবসময় এতকিছুই পাই। এরকম ছাদ বাগান যেন সকলের বাড়িতেই থাকে।

দিৎসা কর্মকার, সপ্তম শ্রেণী, কালিয়াচক, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ন চ ল স

(২) ল কু চা ড়ো

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ক ক কু থা থা অ

(২) কু দ্য দ্য খা খা অ

১৬ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) বারিধারা (২) বারবেলা

১৬ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) হস্তান্তরযোগ্য (২) হংসবাহিনী

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (২) কল্যাণ কর, বলরামপুর, পুরুলিয়া। (৩) শুভম সরকার, গঙ্গারামপুর, দঃ দিনাজপুর। (৪) স্নেহা সরকার, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

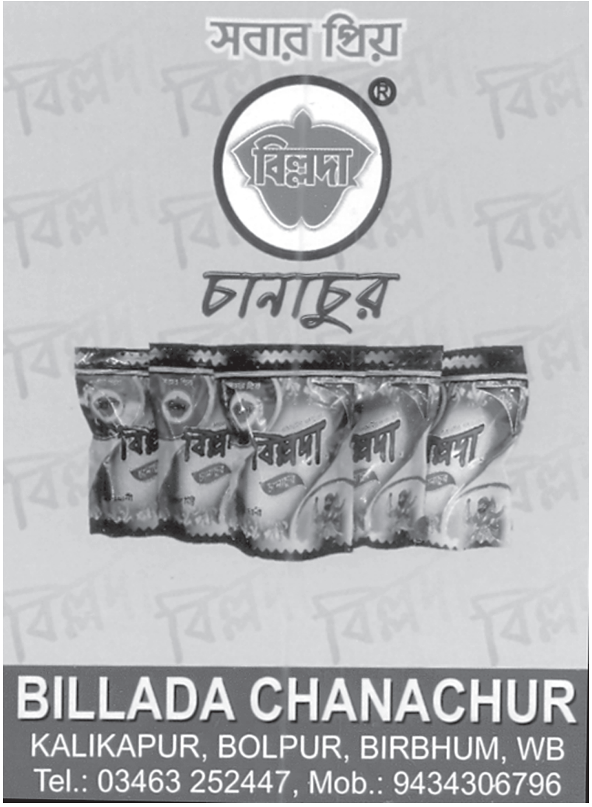

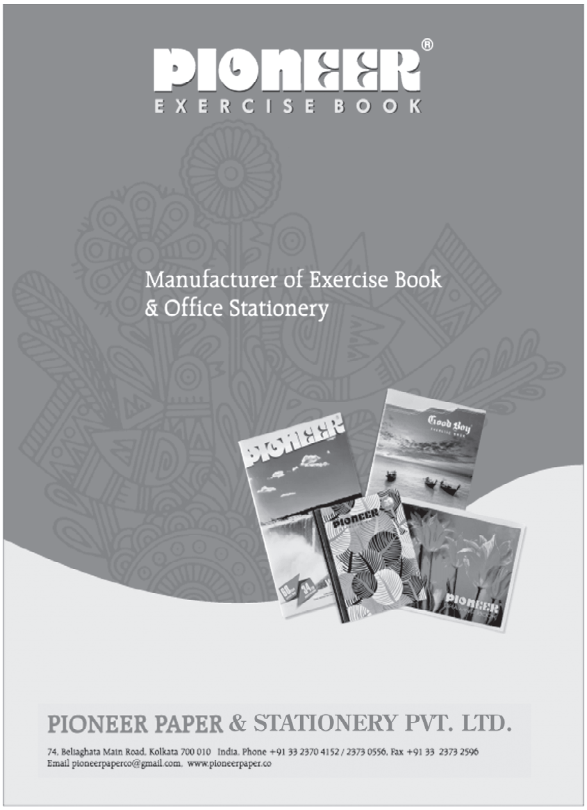

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সাম্রাজ্যবাদ ব্যতিরেকে ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব

সনাতন বিদ্যার্থী

ফান্ডামেন্টালিস্ট শব্দটি বর্তমান বিশ্বে রাজনীতি, সমাজ, ধর্মের পরিসরে সর্বাধিক ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। শব্দটির প্রকৃত অর্থ মূলজাত অর্থাৎ বিশুদ্ধ। এবং সেই সূত্র ধরেই শব্দটির উদ্ভব হয়েছিল, কোনও নির্দিষ্ট ভাবধারায় বিশ্বাসী কিছু বিশুদ্ধবাদী মানুষ বা গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ফান্ডামেন্টালিস্ট শব্দটি ছাপার অক্ষরে প্রথম ব্যবহার করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'দ্য ওয়াচম্যান এক্সামিনার' নামক একটি ব্যাপটিস্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক কার্টিস লি লজ, ১৯২০ সালে। যাঁরা খ্রিস্টধর্মের বিশুদ্ধবাদের জন্য সংগ্রাম করছেন তাঁদের চিহ্নিত করার জন্য। তবে পরবর্তীকালে শব্দটির অর্থের দ্যোতনা পরিবর্তিত হতে থাকে। বাংলাভাষায় এর অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল ধর্মীয় কট্টরবাদ, মৌলবাদ কখনই নয়।

বর্তমানে বব আতেলমেয়ার, ব্রুস হালবার্গার, জুনাস কুনস্ট, লোটে থমসন প্রমুখ মনোবিজ্ঞানের গবেষকগণের মতে 'কট্টরবাদ' হলো কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে উপস্থিত এমন কিছু প্রবণতা, যার বৈশিষ্ট্য হলো কোনো ধর্মগ্রন্থ, মতবাদ বা আদর্শের কঠোর ও আক্ষরিক ব্যাখ্যা এবং সেই নিরিখেই নিজের গোষ্ঠীভুক্ত ও গোষ্ঠীবহির্ভূত মানুষদের পৃথকীকরণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করা। ওই বিশেষজ্ঞদের গবেষণার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হলো আব্রাহামিক ধর্মমতগুলি। এই আব্রাহামিক মতের অন্যতম ইসলামে কীভাবে এই জাতীয় ভাবধারার প্রয়োগ ঘটেছে তারই তত্ত্বগত দিকটি বর্তমান আলোচনার প্রতিপাদ্য।

ইসলামিক কট্টরবাদ এমন এক বিষয়, যার সঙ্গে ভারতীয়ত্বের মৌলিক ভাবনাটির সংঘাত সহস্রাধিক বছর ধরে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে ভারত ভূখণ্ড থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সুদূর আরবের রুক্ষ মরুভূমিতে সৃষ্ট একটি মজহবের প্রকৃত রূপ ঠিক কীরকম ছিল তা কিন্তু এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। বরং এখানে আমরা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব একটি ভিন্নতর প্রশ্নের। সে প্রশ্ন হলো, এই আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়েও ঠিক কোন কারণে সুদূর মধ্যযুগের এই মজহবকে কোনো কোনো ভারতীয় পণ্ডিত এদেশের মাটিতে এমনভাবে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন বা করে থাকেন, যা ভারতবর্ষের মৌলিক ভাবধারার পরিপন্থী।

ইসলাম একটি সংগঠিত সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা যার ভিতর এর অনুগামীদের জন্য প্রতিটি আচার আচরণ নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত। বিশিষ্ট গ্রন্থকার, গবেষক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী তাঁর 'ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত : কোরানের সংক্ষিপ্তসার' পুস্তিকায় (বঙ্গীয় সনাতন পরিষদ) লিখেছেন, 'ইসলামের মোট ছ'টি কলেমা বা সংকল্পবাক্য আছে। যার মধ্যে প্রথম কলেমা বা কলেমা তৈয়বকে বলা হয় ইসলামের প্রাণ। এই কলেমা তৈয়ব হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদুর রসুলুল্লা'। অর্থাৎ আল্লা ব্যতীত উপাস্য নাই এবং মহম্মদ আল্লার রসুল বা বার্তাবাহক বা পয়গম্বর। ইসলামে এই কলেমার এতই গুরুত্ব যে বলা চলে, এই কলেমা তৈয়বে যারা বিশ্বাস করে না, তারাই কাফের।... ইসলাম শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো আত্মসমর্পণ। বিশেষ অর্থে আল্লার কোরান ও আল্লার রসুল মহম্মদের কাছে

ফ ঃ ৬

আত্মসমর্পণ। যে সমস্ত ব্যক্তি আল্লার কোরান ও নবি মহম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং কলেমায় বিশ্বাস করে, তারাই হলো আত্মসমর্পণকারী ইমানদার মুসলমান বা মোমেন। যারা তা করে না তারাই হলো কাফের।'

কাফেরদের প্রতি ইসলামের বিধান প্রসঙ্গে ড. ব্রহ্মচারী লিখেছেন— 'কোরান বলছে— 'আমি অবশ্যই নরকের জন্য বহু জাতির মানব সৃষ্টি করেছি তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু আছে কিন্তু দেখে না; তাদের কর্ণ আছে কিন্তু শোনে না। ওরা পশুর ন্যায় এবং তা অপেক্ষাও অধিক মূঢ়', সুরা-৭ আয়াত-১৭৯। ...পবিত্র ঈদের নামাজের পর ইমাম যে খুৎবা দেন তা থেকে কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে। ...হে আল্লা, আপনি ইসলাম ও মুসলমানদের চিরকাল জয়যুক্ত করুন, আর অবাধ্য কাফের, বেদআত ও মোশরেকদের সর্বদা পদানত ও পরাস্ত করুন। ...তাঁরই তরবারি দ্বারা বিদ্রোহী, মহাপাতকী ও অবাধ্যদের অর্থাৎ কাফেরদের মস্তকচ্ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন।'

এরপরে ড. ব্রহ্মচারী ইসলামের সিদ্ধান্তগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন। প্রথম সিদ্ধান্তগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ''প্রথম সিদ্ধান্ত 'মিল্লাৎ ও কুফর'-এর মিল্লাৎ বলতে বোঝায় সৌভ্রাতৃত্ব বা ভাইচারা।... মৃত্যুর ঠিক আগের বছর নবি মহম্মদ মক্কায় হজ করতে গিয়ে আরাফত (মিলন)-এর ময়দানে যে বিদায় ভাষণ (Farewell address) দেন, তাতে তিনি মুসলমানদের তিনটি উপদেশ দেন। এই উপদেশ তিনটির মধ্যে সর্বপ্রধান উপদেশই ছিল 'কুল্ল মুসলেমীন ইখুয়াতুন'। এই উপদেশ থেকেই আজকের বিশ্বব্যাপী মুসলমান ভ্রাতৃত্ব বা 'ইসলামি উন্মা'র জন্ম হয়। ...ইসলামের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত দার-উল-ইসলাম এবং দার-উল- হার্ব বলছে যে, এই পৃথিবীতে যত দেশ আছে তা দুইভাগে বিভক্ত। দার-উল-ইসলাম হচ্ছে সেই সমস্ত দেশ, যেগুলো ইতিমধ্যে ইসলামের অধিকারে চলে এসেছে।''

বর্তমানে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান ইত্যাদি ইসলামিক দেশ। দার-উল-হার্বের আক্ষরিক অর্থ হলো বিধর্মীদের দেশ। সেই সমস্ত দেশ, যেগুলো এখনও মুসলমানদের অধিকারে আসেনি এবং যেখানে মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। ড. ব্রহ্মচারীর কথায়, 'ইসলামের অন্তিম লক্ষ্য হলো পৃথিবীর সমস্ত দার-উল-হার্বকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করে সমগ্র বিশ্বে আল্লার রাজত্ব কায়েম করা।' অর্থাৎ ইসলামি মজহবের সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। বিষয়টিকে উদ্ধৃত করে ইজরায়েলের হাফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্যাব্রিয়েল বেনডর এবং তাঁর সহ গবেষক আমি পেদাজুর তাঁদের 'দ্য ইউনিকনেস অব ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড দ্য ফোর্থ ওয়েভ অব ইন্টারন্যাশনাল টেররিজম, ২০০৩' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'In no other major religion is there such an intimate interrelationship between religion and state, hence religious extremism in Islam had more greater political implications and ramifications than in other cases।'

এবার দেখা যাক, পৃথিবীর সমস্ত দার-উল-হার্বকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার পদ্ধতিটি কী। ইসলাম অনুযায়ী সেই পদ্ধতি হলো জিহাদ। স্যার যদুনাথ সরকার 'আ শর্ট হিস্ট্রি অব ঔরঙ্গজেব' গ্রন্থে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'Islamic theology, therefore, tells the true believer that his highest duty is to make exertion (jihad) in the path of God by waging war against infidel lands (dar-ul-harb) till they become a part of the realm of Islam (Dar-ul-Islam) and their populations are converted into believers. After the conquest the entire infidel population becomes theoretically reduced to the status of slaves of the conquering army.'

জিহাদ কথাটির উৎপত্তি আরবি শব্দ জাহাদা হতে, যার অর্থ কোনো কার্যসাধনের জন্য শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা। এই প্রসঙ্গে লেবানিজ বংশোদ্ভূত প্রখ্যাত মার্কিন লেখিকা, সাংবাদিক, সমাজকর্মী এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজনৈতিক বক্তা ব্রিজিট গ্যাব্রিয়েলের 'দে মাস্ট বি স্টপড' বইটির একটি পর্যবেক্ষণ প্রণিধানযোগ্য। তা হলো, 'when you examine the history of Islam and the commandments of the Koran that endorses jihad as a military tool, that it becomes clear that the term Jihad refers mostly to war against non-belivers.'

এবার পরবর্তী প্রশ্ন। প্রতিটি মুসলমানেরই জিহাদে অংশ নেওয়া কি বাধ্যতামূলক? প্রখ্যাত গ্রন্থকার, চিন্তাবিদ ও প্রবীণ গবেষক ড. এম এ খান তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইসলামিক জিহাদ : আ লেগেসি অব ফোর্সড কনভারশন, ইম্পিরিয়ালিজম অ্যান্ড স্লেভারি (আই ইউনিভার্স ইনকর্পোরেশন, ২০০৯)-এ এর একটি প্রাঞ্জল উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'Muhammad was the best amongst God's numerous prophets and the embodiment of the highest perfection of human life... In Islamic belief, Muslims who live their life as perfectly as that of Prophet Muhammad will enter Paradise without ever serving any time in hell. But it is almost impossible for a Muslim to emulate Muhammad's sinless life. Therefore, most Muslims will first save some period of time, being roasted in the horrifying fire of Islamic hell.'

তাহলে কি নরকের আগুন থেকে বাঁচার আর কোনো পথ মুমিনদের নেই? অবশ্যই আছে! এম এ খান আরও বলেছেন, 'The only other group of Muslims who will enter Paradise, bypassing the roasting in helifire, are those who would die as martyrs while fighting in the cause of Allah, e.g. while engaging in Jihad or holy war [Quran 9 : 111]... Other Muslims, who die a normal death, will have to wait until the Judgement Day after the end of the world for Allah to judge how much time they will have to spend in hell before they can enter Paradise.'।

এই বিশেষ ব্যাখ্যার সূত্র ধরে এদেশে ইসলাম অনুসারী কিছু

সংখ্যক মানুষ একথা মনে করেন বা নিজের সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস সঞ্চারিত করেন যে, কোনও সক্ষম মুসলমানেরই জিহাদে অংশগ্রহণ না করে উপায় নেই। এবং এই জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুসলমানকে বলা হয় মুজাহিদ বা আল্লার সৈনিক। বহুবচনে মুজাহিদিন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জিহাদ শব্দটি যথাযথ অর্থ নিয়ে একাধিক মত আছে। জিহাদ বিষয়টির স্বরূপ যথেষ্ট জটিল। কিন্তু সচেতন বা অসচেতনভাবে জিহাদদের উপরোক্ত ব্যাখ্যাটিই বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অধ্যাপক বেন-ডর ও পেদাজুর যে কারণে বলেছেন, 'it is only in Islam that there is such an explicit doctrine of fighting for the faith and a doctrine too that is so deeply ingrained in the popular mind.' ইসলামের এই কট্টরবাদী ব্যাখ্যার সঙ্গে ফ্যাসিজমের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রবল সাদৃশ্য থাকায় ১৯৩৩ সালে বিষয়টিকে প্রথম চিহ্নিত করা হয়েছিল 'ইসলামোফ্যাসিজম' শব্দটির।

১৮০৪ সালে ফারসি ভাষায় রাজা রামমোহন রায় লিখিত তুহফ-উ-মুওয়াহিদ্দিন '(বঙ্গার্থে একেশ্বরবাদীদের উপহার) নামক গ্রন্থের ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ইসলাম' প্রবন্ধে (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাম কৃত বঙ্গানুবাদ, ১৯৪৯) বলা হয়েছে, 'ইসলামানুবর্তীরা কোরানের পবিত্র শ্লোকের মর্মানুসারে (যথা-পৌত্তলিকদের যেখানে পাও বধ কর এবং অবিশ্বাসীদের ধর্মযুদ্ধ (জিহাদ) করে বেঁধে আনো এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে মুক্ত করে দাও বা বশ্যতা স্বীকার করাও) এগুলি ঈশ্বরের (আল্লার) নির্দেশ বলে উল্লেখ করে, যেন পৌত্তলিকদের (হিন্দুদের) বধ করা এবং তাদের নানাভাবে নির্যাতন করা ঈশ্বরাদেশে অবশ্য কর্তব্য। মুসলমানদের মতে ওই ভেলিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই সবচেয়ে পৌত্তলিক (ঘৃণ্য)। সেইজন্যই ইসলামানুবর্তীরা সর্বদাই ধর্মোন্মাদনায় মত্ত হয় এবং তাদের ঈশ্বরের (আল্লার) আদেশ মানবার উৎসাহে 'বহু দেবদেবাদিদের' (অর্থাৎ হিন্দুদের) ও মেষ পয়গম্বরের (মহম্মদের) ধর্ম প্রচারে 'অবিশ্বাসীদের' (অমুসলমানদের) বধ করতে ত্রুটি করেনি।'

বাঙ্গলার নবজাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে অভিহিত এবং মুক্তচিন্তার অন্যতম পথিকৃৎ রামমোহন রায়ের মতো ব্যক্তিত্বের এহেন বক্তব্যের লক্ষ্য সেই সব কট্টরবাদী শক্তি যারা ইসলামিক জিহাদের প্রচলিত ধারণাটিকে আক্ষরিক অর্থেই ভারতের বুকে রূপায়ণ করে চলেছে বা নিরন্তর করার চেষ্টা করে চলেছে, যতই তা দেশের আদর্শ বা আইনের পরিপন্থী হোক না কেন। এবং এই চেষ্টা চলেছে বহু শতাব্দী ধরে, প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে। সেকারণেই একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে ভারত তথা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘমেয়াদি শান্তি, সুস্থিতি ও উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই অতি সংবেদনশীল বিষয়টির প্রতি জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের গুরুত্ব দিয়ে ভাবার সময় এসেছে। শুধু আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। গণতন্ত্রের সবকটি স্তম্ভের সক্রিয় ভূমিকার পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অবহতি, সচেতনতা ও ইতিবাচক পদক্ষেপই একমাত্র এই বিষয়ে এক যথার্থ ফলপ্রসূ পদক্ষেপ হতে পারে। ▯

সংসদ বনাম বিচার ব্যবস্থা

সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যা মোটেই কাম্য নয়

মন্দার গোস্বামী

সংবিধান কি গণতন্ত্রের উপরে? বিচার বিভাগ কি তারও উপরে? সংবিধান প্রবর্তনের ৭৩ বছর পরেও এই প্রশ্ন আবার সামনে আসছে, সৌজন্যে বিচার বিভাগ। সংসদ না বিচার বিভাগ কে সর্বাপেক্ষা বেশি শক্তিশালী এই দ্বন্দ্ব প্রথম থেকেই চলে আসছে। সংসদের বক্তব্য, সংবিধানের ১৬৮ ধারা অনুযায়ী সংসদ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। এই ধারা অনুযায়ী সংসদ সংবিধানের যেকোনো অংশ সংশোধন করতে পারে, যেকোনো ধারা মুছে ফেলতে অথবা নতুন করে জুড়ে দিতে পারে। বিচার বিভাগের বক্তব্য হলো, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়। যদিও সংবিধান প্রবর্তনের একেবারে গোড়ার দিকে বিচার বিভাগ সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সীমাহীন ক্ষমতাকে মান্যতা দিয়েছিল। কিন্তু গোলকনাথ বনাম পঞ্জাব সরকারের আইনি বিবাদে সংসদের সংবিধান সংশোধনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পুনরায় প্রশ্নের মুখে পড়ে। এই ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল যে সংসদ তার ইচ্ছামতো সংবিধান সংশোধন করতে পারে না।

এরপর সংসদ তার সংবিধান সংশোধনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ফিরে পেতে ২৪, ২৫ ও ২৯তম সংশোধনী আনে। ২৪তম সংশোধনী ছিল নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত এবং ২৯তম সংশোধনীটি ছিল ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত। সংসদের বক্তব্য ছিল, তাকে দেশ চালাতে হয়। দেশের স্বার্থ অনুযায়ী প্রয়োজনে মৌলিক অধিকারের পরিবর্তন, পরিমার্জন করা হতে পারে। দেশের পরিকাঠামোর উন্নয়নে, নিরাপত্তার কারণে, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির স্বার্থে নাগরিকদের ভূমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কতটা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তা ঠিক করবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সংসদ; বিচার বিভাগ নয়।

ভূমি সংস্কার আইনটিকে নবম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হলো অর্থাৎ নবম তফশিলের নিয়ম অনুযায়ী বিষয়টি আর আদালতের বিচার্য ক্ষেত্রের মধ্যেই থাকলো না। এই পরেই আসে কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল সরকারের আইনি বিবাদ। যেখানে উপরোক্ত সংশোধনীগুলিকে সুপ্রিম কোর্টে পুনরায় চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান কলেজিয়াম ব্যবস্থার বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে যা নিয়ে আজ দেশজুড়ে চর্চা চলছে। সংসদ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতার প্রশ্নে এই মামলাটির রায় একটি মাইলফলক। ১৩জন বিচারপতির একটি বিশেষ বেঞ্চে ৬৮দিন ধরে বিচার প্রক্রিয়া চলেছিল। ৭০টির বেশি দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করা হয়েছিল। রায় ছিল ৭০৩ পাতার। যদিও বিচারপতিগণ রায়ের বিষয়ে একমত ছিলেন না। ৬/৭ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ১৯৭৩ সালের ২৪ এপ্রিল রায় ঘোষণা হয়েছিল। রায়টি এক অর্থে ঐতিহাসিক বলা চলে। এই রায় অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনের সংসদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ সংসদের আগের ২৪,২৫ ও ২৯তম সংশোধনীকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। পাশাপাশি আবার 'সংবিধানের মূল কাঠামো' নামক এক নতুন তত্ত্বের জন্ম দেওয়া হয়। বিতর্কের সূত্রপাত এখানেই।

মূল সংবিধানে 'সংবিধানের মূল কাঠামো' বলে কোনো শব্দবন্ধ নেই। সুপ্রিম কোর্টেই এর জন্ম। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য ছিল, সংসদ সংবিধানের যেকোনো অংশ সংশোধন করতে পারে কিন্তু 'সংবিধানের মূল কাঠামো'-কে কোনোভাবেই সংশোধিত করতে পারবে না, এটি চির অপরিবর্তনীয়। এবার প্রশ্ন উঠবে, 'সংবিধানের মূল কাঠামো'টি কী? স্পষ্ট পরিভাষা না দিলেও সেটি আবার সুপ্রিম কোর্টই ঠিক করে দেয়— 'যেমন স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ, মৌলিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি। এও বলা হলো যে আগামীদিনে আরও কিছু বিষয় 'সংবিধানের মূল কাঠামো'-র মধ্যে ঢুকতে-বেরুতে পারে, এবং সেটিও ঠিক করবে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট; গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংসদ নয়।

তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়ালো যে আপনাকে অনেক রসগোল্লা দেওয়া হলো কিন্তু কটা খাবেন আর কোনটি মূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সেটি ঠিক করে দেবে অন্যজন। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্র বুঝতে পারছেন কারা নিজেরাই নিজেদের অধিকতর ক্ষমতাশালী তৈরি করল। আজকের কলেজিয়াম ব্যবস্থাও খানিকটা তাই। এখানে বিচারপতিরাই বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। মাত্র পাঁচজন বিচারপতি ১৫০ কোটির জনসংখ্যার দেশে সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করে থাকেন। অদ্ভুতভাবে এখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের কোনো নির্ণায়ক ভূমিকা নেই। ১৯১৪ সালে মোদী সরকার কলোজিয়াম ব্যবস্থার সংস্কারসংক্রান্ত একটি আইন সংসদে পাশ করে। কিন্তু সংবিধানের 'মূল কাঠামো'র দোহাই দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট আইনটিকে 'অসাংবিধানিক' ঘোষণা করে। প্রাক্তন বিচারপতি সোধি ঠিকই বলেছেন, কলেজিয়াম ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচারপতিগণ সংবিধানকে হাইজ্যাক করেছেন। সুস্থ গণতন্ত্রে এমনটি চলতে পারে না। কারণ বিচার বিভাগও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-সহ অন্য তিনজন সিনিয়র বিচারপতি তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। কিছুদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমিত্র সেন দুর্নীতির দায়ে ইম্পিচমেন্ট হয়ে পদত্যাগ করেন। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে লোয়ার কোর্টের বিচারক-সহ বহুজনের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে। অনেকে জেলে পর্যন্ত গিয়েছেন। বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচারপতিদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্কই নাকি অন্যতম রসায়ন, এমন অভিযোগও উঠেছে। তাই সুষ্ঠু গণতন্ত্রের স্বার্থে কলেজিয়াম ব্যবস্থা-সহ বিচার বিভাগের অবশ্যই সংস্কার প্রয়োজন, আর এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংসদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। ◻

ভারত থেকে পাততাড়ি গোটালো ইউনাইটেড নেশনসের মিলিটারি অবজার্ভার গ্রুপ

বিশেষ প্রতিনিধি॥ আরও একটি সাহসী পদক্ষেপ নিল বর্তমান নরেন্দ্র মোদী সরকার। জাতি সঙ্ঘের কমিটি 'দ্য ইউনাইটেড নেশনস্ মিলিটারি অবজার্ভার গ্রুপ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান (ইউএনএমওজিআইপি)-কে ভারত থেকে পাততাড়ি গোটানোর নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। ইউনাটেডে নেশনস-এর এই কমিটি গত ৭৪ বছর ধরে ভারতে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। প্রসঙ্গত ১৯৪৮ সালের পর থেকেই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ পর্যবেক্ষণ ও মধ্যস্থতা করার জন্য কাশ্মীরের শ্রীনগরে দপ্তর খুলে বসে ইউএনএমওজিআইপি। তবে বিশেষজ্ঞ মহলের দাবি, পড়শি দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সমঝোতা করানো ছিল তাদের কাছে গৌণ বিষয়। আসলে তারা ভারতের নিরাপত্তা বিভাগের ওপরেই নজরদারি চালাতো।

দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথ দেখানোর। সূত্রের মতে ভারতের আতিথেয়তাকে কাজে লাগিয়ে 'ইউনাইটেড নেশনস মিলিটারি অবজার্ভার গ্রুপ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান' ভারতের গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বিষয়ক নথি পাচার করতো আমেরিকার কাছে। আর আমেরিকা সেই তথ্য সরবরাহ করতো পাকিস্তানকে। ভারতের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যেই তারা পাকিস্তানের আইএসআই ও তাদের সন্ত্রাসী আর্মিকে ব্যবহার করতো। ২০১৩ সালে প্রকাশিত ভারতের নিরাপত্তা বিষয়ক একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ভারতকে তাদের উচ্চ নজরদারিতে রেখেছে মার্কিন মুলুক। আর এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো ভারতেই ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা ইউনাইটেড নেশনস-এর মিলিটারি অবজার্ভার গ্রুপটি।

কাশ্মীর বিষয়ে বিতর্কিত বিবৃতির পর ইউএনএমওজিআইপি'র বিরুদ্ধে

সূত্রের খবর ইউএনএমওজিআইপি'র ৪০ জনের ওই কমিটির এতবছর ধরে ভরণ-পোষণের খরচ পুরোটাই বহন করতে হতো ভারত সরকারকে। এমনকী পরিবহণ-সহ বিবিধ খরচের ব্যয়-ভার যেত ভারতীয় কোষাগার থেকে। রাষ্ট্র সঙ্ঘের এই পর্যবেক্ষক গ্রুপ শ্রীনগরের সরকারি জমি দখল করে বিশাল এলাকা জুড়ে তাদের দপ্তর পরিচালনা করত। সম্প্রতি ইউএনএমওজিআইপি কমিটি কাশ্মীর প্রসঙ্গে একটি বিতর্কিত বিবৃতি জারি করে। তারা জানায়, জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে বিরোধ শুধু ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নয়। এটি ত্রিপাক্ষিক সমস্যা। কারণ এর মধ্যে চীনও জড়িত রয়েছে। এই বিতর্কিত বিবৃতির পর তারা ভারত সরকারকে তাদের আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করারও আবেদন জানায়।

১৯৭২ সালের সিমলা চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, কাশ্মীর সমস্যা ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সমস্যা। দুই পড়শি দেশ ছাড়া তৃতীয় কোনও পক্ষের সেখানে নাক গলানোর অধিকার নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে সেই সময়েই ভারতের উচিত ছিল ইউএনএমওজিআইপি কমিটিকে অবিলম্বে পদক্ষেপ করে নরেন্দ্র মোদী সরকার। ভারতে বসবাসকারী ৪০ জন সদস্যের ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়। তাদের গতিবিধির ওপর প্রতিবন্ধকতা লাগানো হয়। শুধু তাই নয়, ১০ দিনের মধ্যে লটবহর-সহ ভারত ছাড়তে বলা হয়েছে ইউএনএমওজিআইপি-কে। এই বিষয়ে কাশ্মীর বিশেষজ্ঞ ড. গণেশ মালহোত্রা বলেন, ''১৯৭২ সালের ভারত-পাকিস্তান সিমলা শান্তি চুক্তি অনুসারে ভারত বা পাকিস্তান কোনও পক্ষই অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে কোনও তৃতীয় পক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করতে পারবে না। সেখানে ইউএনএমওজিআইপি যেভাবে কাশ্মীর ইস্যুতে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে চীনের কথা উল্লেখ করেছে, তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমেরিকা বা চীনের মতো দেশগুলোর এবার বোঝা উচিত, যে এটা ১৯৪৮ বা ১৯৬৫ সালের ভারত নয়। এখন ভারতের গায়ে ইট মারলে পাটকেল খাওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে।

এই সত্যটা পাকিস্তান হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছে। অন্যরাও যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ভালো।" ❑

নৌবাহিনীর জলযানে রোলস ইঞ্জিন

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ গার্ডেনরিচে নির্মিত হতে চলেছে দেশের অত্যাধুনিক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন। দ্রুত ধাওয়া করে শত্রুপক্ষের জাহাজের কাছে পৌঁছানো ও প্রতিরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগবে এমন জলযানের ব্যবহারের জন্য জার্মানির রোলস রয়েস সলিউশন সংস্থার কাছ থেকে প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে ভারতের মাটিতে নৌবাহিনীর জলযানের উন্নতমানের ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি করবে গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডারস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই)। জলপথে টহলদারি ছাড়াও উচ্চক্ষমতার ওই রোলস ইঞ্জিন তৈরি করা হবে। এতদিন এগুলো বিদেশের মাটি থেকে আমদানি করতে হতো।

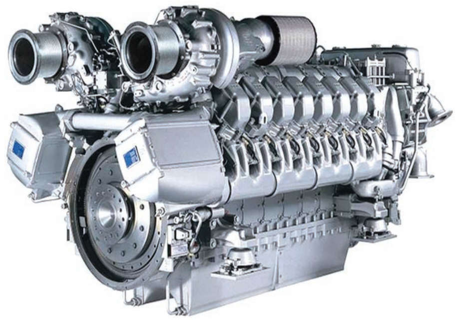

এমটিইউএস ৪০০০ মানের ওই ইঞ্জিন দেশের মাটিতে তৈরি ছাড়াও তার যন্ত্রাংশ উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ-সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে জার্মানির সংস্থাটি। তাদের প্রযুক্তিগত সহায়তায় এদেশেই তৈরি হবে ৭৮৬-৪৩০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার ইঞ্জিন। গত ২৭ জানুয়ারি গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্সের সিএমডি পিআর হরি, এমটিইউ ইন্ডিয়ার তরফে জিএস সেলউইন ও ভারতীয় নৌবাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে চুক্তি হয়। সিএমডি পি আর হরি বলেন, "এই চুক্তি ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য উন্নতমানের জলযান তৈরির ক্ষেত্রে ভারতের আত্মনির্ভরতার পথ প্রশস্ত করবে।"

ভারত সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রোজেক্টের আওতায় এই রোলস ইঞ্জিন তৈরি হবে।

নেপালের শালগ্রাম শিলায় রাম-সীতা বিগ্রহ

নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ অযোধ্যায় নির্মীয়মাণ রামমন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতার বিগ্রহ তৈরি হবে শালগ্রাম শিলায়। সেই শালগ্রাম শিলা নিয়ে আসা হচ্ছে নেপাল থেকে। ইতিমধ্যেই বিশালাকার দুটি শালগ্রাম শিলা নেপাল থেকে পাড়ি দিয়েছে অযোধ্যার উদ্দেশে। 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট'-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রামায়ণে উল্লেখিত সীতার জন্মস্থান নেপালের জনকপুর থেকে রওনা দেওয়া শালগ্রাম শিলা দুটি উত্তরপ্রদেশের রামক্ষেত্রে এসে পৌঁছাবে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই। তার পরেই শুরু করা হবে শ্রীরামচন্দ্রের তিন ফুট দীর্ঘ বিগ্রহ তৈরির কাজ।পুরো বিষয়টির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন নেপালের উপপ্রধানমন্ত্রী বিমলেন্দ্র নিধি। নেপালের কালী গণ্ডকী নদীতে পাওয়া গিয়েছিল বিশালাকার দুটি শালগ্রাম শিলার খণ্ড। নেপালের খনিজ ও ভূতাত্ত্বিক সূত্রের খবর, ওই দুটি শালগ্রাম শিলাখণ্ডের ওজন ৩৫ টন। এবং বয়স কম করে ৬ কোটি বছর।

অযোধ্যার রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট সেই শিলাদুটির জন্য আবেদন জানায় নেপাল সরকারের কাছে। সম্প্রতি সেই শালগ্রাম শিলা দুটি ভারতে পাঠানোর ছাড়পত্র দিয়েছে নেপাল সরকার এবং নেপালের খনিজ ও ভূতাত্ত্বিক বিষয়ক মন্ত্রক। ইতিমধ্যে সেই শালগ্রাম

শিলা দুটি যাচাই করে এসেছেন রাম জন্মভূমি ট্রাস্টের প্রতিনিধি দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক সদস্য। রাম-সীতার বিগ্রহ এমন প্রযুক্তিতে তৈরি করা হবে যেখানে ১০০ ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়েও সব ভক্তরা পূর্ণাবয়ব বিগ্রহ দর্শন করতে পারবেন। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট জানিয়েছে, মন্দিরে রামলালার বিগ্রহের পাশেই থাকবে নবনির্মিত রাম-সীতার বিগ্রহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগেই জানিয়েছেন, আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে রামমন্দিরের উদ্বোধন করা হবে। তার আগে দেশজুড়ে চলবে মন্দির উদ্বোধনের প্রচারাভিযান।

স্বস্তিকা
(জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক)
২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬, দূরভাষ : (০৩৩) ২২৪১-০৬০৩, ৫৯১৫
E-mail : swastika 5915@gmail.com

স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

আশাকরি আপনি শ্রীভগবানের কৃপায় সপরিবারে কুশলে আছেন। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে গত জন্মাষ্টমী তিথিতে (১৯.০৮.২২) স্বস্তিকা পত্রিকা ৭৪ বছর অতিক্রম করে ৭৫ বছরে পা রেখেছে। গত ২২ আগস্ট স্বস্তিকার ৭৫ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি দিয়ে ৭৫-এর পথ চলা শুরু হয়েছে। বিগত ৭৫ বছরে বহু বাধানিষেধ সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক প্রচেষ্টায় স্বস্তিকা চলার পথকে অব্যাহত রেখেছে। কোনও কিছুর কাছে মাথা নত করেনি। ব্যতিক্রম শুধু গত করোনা মহামারীর কারণে কয়েক সপ্তাহ ছাপার অক্ষরে আপনাদের হাতে পৌঁছোতে পারেনি।

স্বস্তিকার চলার পথে এই শুভ ৭৫-তম বর্ষটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উদ্‌যাপনের জন্য একটি স্বাগত সমিতিও গঠন করা হয়েছে। তাঁরাও এক বছরের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রাখবেন। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে স্বস্তিকার গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান হাতে নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে তিন বঙ্গের সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ও বিবিধক্ষেত্রের প্রমুখ কার্যকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন। আমরা চাই সমস্ত খণ্ড/গ্রামস্তর পর্যন্ত কমপক্ষে প্রতি শাখায় দশটি (মিলন ও মণ্ডলী-সহ) স্বস্তিকা পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাক। সরাসরি হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে স্বস্তিকা দপ্তর। বিশেষত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক আগ্রহী পাঠক আছেন যাঁরা স্বস্তিকা পড়তে আগ্রহী। এমতাবস্থায় বিনীত আবেদন যে সকলে মিলে একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে ৭৫ বছরে ৭৫০০০ স্বস্তিকার গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চিত করুন।

তিলকরঞ্জন বেরা
সম্পাদক

।। চিত্রকথা ।। মহামানব মহানামব্রত ।। ৩০ ।।

সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায়, হতাশায় বিফল মনোরথ মহানামব্রতজী হোটেলে এসে গুরুদেব মহেন্দ্রজীকে চিঠিতে জানালেন— প্যারিসের নদীতে আত্মবিসর্জন করবেন।

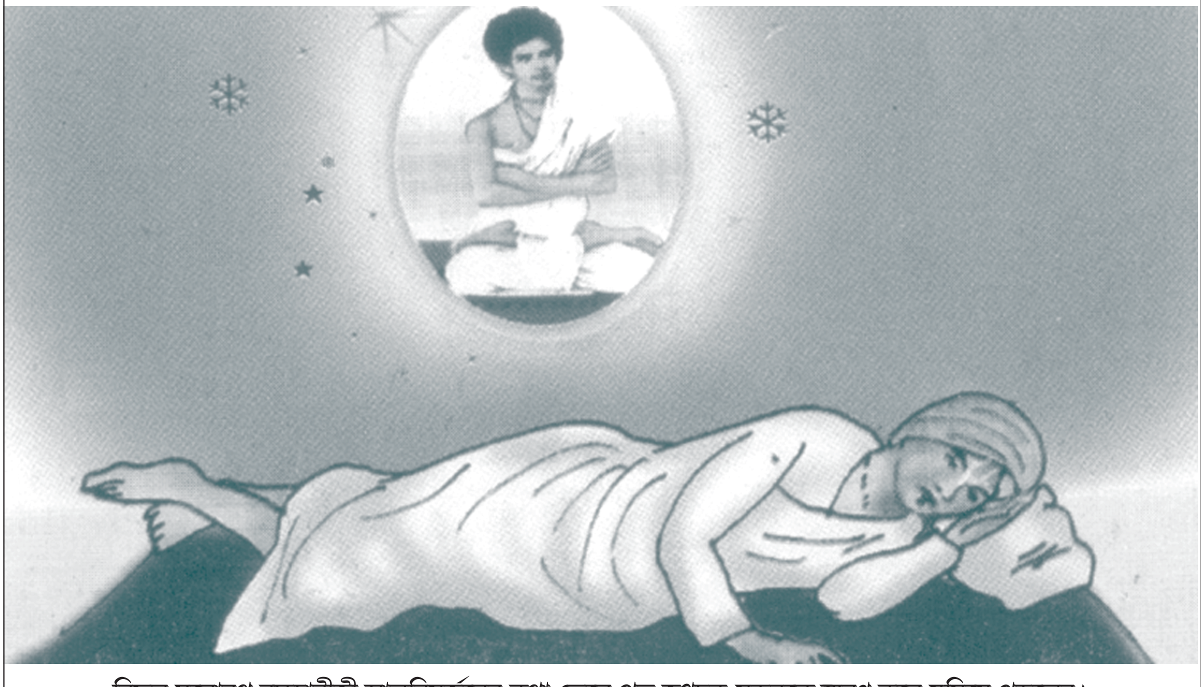

বিফল মনোরথ ব্রহ্মচারীজী আত্মবিসর্জনের কথা ভেবে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরকে স্মরণ করে ঘুমিয়ে পড়লেন।

(ক্রমশ)